কালোত্তীর্ণ সম্পদ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চলতি দুনিয়া প্রকাশনী
৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ১২

ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের গোড়ার পর্বগুলো সম্পর্কে আমার স্মৃতি লেখার চেষ্টা করেছি। আমার চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে তুলতে গিয়ে আমি পুনরায় পুরনো দিনগুলোতে বেঁচে উঠেছি, বিশেষ করে ১৯৪১ সালের ২২ জুনের পরবর্তী সেই দিনগুলিতে যখন সোভিয়েত ভূমির বিরুদ্ধে হিটলার তার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ও বিপুল শক্তিশালী আক্রমণ শুরু করে। ভারতে আমাদের অনেকের পক্ষেই সেই দিনগুলি ছিল উদ্বেগের ও এমনকি যন্ত্রণার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যতোটুকু আত্মস্থ হয়েছিল তাই নিয়েই দেখতে পেয়েছিলাম দুর্যোগের মধ্যে রামধনু। সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রথম-জাত ও অগ্রগণ্য সোভিয়েত তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সঠিকভাবেই পালন করেছিল, নিজেকে বাঁচিয়েছিল তার নিজস্ব অসাধারণ ও অতুলনীয় উদ্যম দিয়ে, নিজের দৃষ্টান্ত ও সকল মানবতার প্রতি প্রেরণা দিয়ে রক্ষা করেছিল তৎকালে ফ্যাশিবাদের দ্বারা গুরুতর বিপদগ্রস্ত বিশ্ব-স্বাধীনতার সম্ভাবনা।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বহু বছর ধরে দৃঢ়ীভূত হয়েছে, বিশেষ করে—আমি জোর দিয়ে বল্‌তে চাই—গৌরবমণ্ডিত সেই বছরগুলিতে (১৯৪১-৪৫) যখন লালফৌজ ও সোভিয়েত জনগণ বিশ্বকে বিস্মিত করেছিল অপরাজেয় বীরত্বে এবং ইতিহাসে অভূতপূর্ব প্রকৃত সৃজনমূলক শ্রমে।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো লিখতে লিখতে আমার চিন্তা চলে গিয়েছে সেই

দিনগুলোতে যখন আমরা অনুভব করতাম, সত্য জেনেই অনুভব করতাম, সঠিকতম অর্থেই সোভিয়েত আমাদের আপনজন। কেননা সে হচ্ছে তুনিয়ার শ্রমজীবী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাকার ও তুর্ভেদ্য তুর্গ—বলা চলে, মানবতার মুক্তির উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইতিহাসের নির্বাচিত হাতিয়ার।

যেমন, বলতে পারি, আমার মন চলে গিয়েছে মধ্য-এশিয়ার রূপান্তরণের মহাকাব্যতুল্য কাহিনীর মধ্যে, সেই বলশেভিক নারীদের মধ্যে যারা ভগ্নীদের মধ্যে কাজ করবার জন্য বোরখা পরেছিল এবং মতান্ধ সনাতনপন্থীদের ইষ্টকবর্ষণে প্রাণ দিয়েছিল। তাছাড়া আমি সেই বিধুর অভিজ্ঞতারও কিছুটা উপস্থিত করতে পেরেছি যার উৎস সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এবং বিশ্বের স্বাধীনতার জন্য সোভিয়েতের লড়াই। যার গৌরব কখনো ম্লান হবার নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ভারতের বন্ধুত্ব হচ্ছে মূলগতভাবে লেনিনের দেশের প্রতি গড়ে তোলা ভারতের অনুভূতির সম্প্রসারণ। যে অনুভূতির জন্ম লেনিনের দেশে সংঘটিত আশ্চর্য সব পরিবর্তন সম্পর্কে উপলব্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে। যে অনুভূতি যুদ্ধের কঠোর-পরীক্ষার সময়ে গভীর প্রীতি ও প্রশংসায় রূপান্তরিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি এই পূর্বকালীন অনুভূতি যে কতখানি সত্য তা স্বাধীন ভারত বারে বারে নতুন করে আবিষ্কার করেছে। বর্তমানে ঘনিষ্ঠতম সম্প্রীতি ও সমঝোতায় আবদ্ধ হয়েছে আমাদের তুটি দেশ।

সোভিয়েতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯৪১ সালে শ্রীমতী বিট্রিস ওয়েব বলেছিলেন, "বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক ও সমানীকৃত গণতন্ত্র"! কী দূরদৃষ্টি! আর আমি যখন 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড' ও অন্যান্য পত্রিকার অনেকগুলো সংখ্যা হাতের কাছে রেখে লিখতে বসেছি তখন আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে সোভিয়েত 'অর্ডার অব লেনিন' ভূষিত হয়েছেন শুধু গণজীবনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা নন, উজবেকিস্তানের উত্তম

মেষপালক রাজ্জাক জেনগিরভব, আজারবাইজানের প্রথম চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী এবং বর্তমানে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ইজ্জাৎ ওরুদজেভাও, এবং আরো অনেক পুরুষ ও নারী যাঁরা প্রকৃতই এক সাহসিক নতুন জীবনে প্রবেশ করেছেন।

কী সৌভাগ্য যে আমাদের দুটি দেশ এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং পরস্পরকে আমরা সাহায্য করতে পারি ও পরস্পরের কাছে শিখতে পারি! সুখেদুঃখে আমাদের বন্ধু হয়ে থেকেছে সোভিয়েত। আর এই প্রাচীন দেশের বন্ধুত্ব এমন একটা কিছু যা সোভিয়েতের পক্ষেও লাভজনক।

অসম্পূর্ণতায় প্রকট এই বইটি লিখতে লিখতে আমি আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে ভালোবাসার কর্তব্য সম্পাদন করেছি। যে ভালোবাসা বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি। যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই একমাত্র পারে মনুষ্যজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও কর্মকরণ সম্পর্কে অন্তত কিছুটা জ্ঞান সে ভালোবাসাকে সুদৃঢ় করেছে। পাঠকরা যদি আমার এই লেখা পছন্দ করেন এবং এই লেখার মধ্যে কিছুটা সার্থকতা খুঁজে পান তাহলে আমি চরিতার্থ ও সুখী হব।

এবারে আমি একটি ব্যক্তিগত বিষয় উল্লেখ করতে চাই এবং সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। অতীতের মধ্যে নিবদ্ধ হতে গিয়ে অনেক কমরেডের কথা এবং বিশেষ করে আমার স্ত্রীর কথা আমি ভেবেছি। যুদ্ধ চলার সময়ে আমার স্ত্রী ছিলেন তরুণী ও আমার জীবনের অংশভাগিনী। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না, মাঝে মাঝে বরং রীতিমতো দুরূহ। তবুও কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছেন সেই সহজাত উপলব্ধি ও নিঃস্বার্থ তিতিক্ষা নিয়ে যা আমাদের দেশের নারীর এক আশ্চর্য ভূষণ। তাঁর সাহায্য ছাড়া হাতের সময়ের মধ্যে এই পুস্তিকা আমি লিখতে পারতাম না।

এক

সময়টা ছিল ১৯৬১ সাল, অবিস্মরণীয় ভাষায় জওয়াহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে আমরা অনেক মূল্যবান উপহার পেয়েছি, তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে বন্ধুত্ব।"

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় সাদাসিধে ছোট্ট একটি বই, তাতে বিধৃত ছিল ভারতে এসে ভারতীয় কর্মী ও কারিগরদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে গিয়েছেন এমন ন'জন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীর ধারণা। বইটির নাম আবেগসঞ্চারী: 'আমাদের হৃদয়ে ভারত'।

বেশি আগের কথা নয়, শোনা গিয়েছিল একজন সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ ষোড়শ শতকের হিন্দুস্থানের মহান অন্ধ চারণ-কবি সুরদাস সম্পর্কে নিবন্ধ রচনা করেছেন। রচনার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে গবেষিকা নাতালিয়া সাজানোভা পুরনো কালের তীর্থযাত্রীর মতো পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন মথুরা ও বৃন্দাবন থেকে রাজস্থান বারাণসী ও হিমালয় পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তির অনুগামীদের কাছে পবিত্র মন্দিরে ও স্থানে। সকল সোভিয়েত মনীষীর মতো এই মহিলাও যা করছিলেন সেটা যাদুঘরের দ্রষ্টব্য বিদেশী বস্তুর অনুশীলন ছিল না। ছিল না আবেগতাড়িত পর্যটন বা "প্রাচ্যদেশীয়" রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উন্মত্ত অনুসন্ধান। ছিল বিশ্বকে জানবার জন্য বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসার অঙ্গ। এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে আরও ছিল একটি বন্ধুভাবাপন্ন দেশের হৃদস্পন্দনের পিছনে যা থাকার কথা তারও কিছু।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ

ব্রেজনেভ ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে তাঁর স্মরণীয় ভারত-সফরের সময়ে এবং অন্যান্য উপলক্ষে শক্তি ও মাধুর্য-মণ্ডিত ভাষায় বন্ধুত্বের এই **ঘটনার** ওপরে জোর দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাদের উভয় দেশই একথা জেনেছে যে আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে এমন কিছু নেই যা অনবস্থিত। কি ভালো, কি খারাপ, সকল আবহাওয়াতেই এই বন্ধুত্ব অটুট থেকে গিয়েছে। ব্রেজনেভের দ্যোতনাপূর্ণ ভাষায় বলা চলে, 'কালোত্তীর্ণ সম্পদ'।

এই বন্ধুত্বের প্রতি ভারত তার নিজস্ব ধরনে গভীর প্রতিদান দিয়েছে। শুধু সাম্প্রতিক দশকগুলিতে নয়, এমনকি যখন সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য লড়াই চালাচ্ছিল তখনও তার হৃদয়ে ছিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে প্রীতির স্থান, যে-দেশের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল সকল দেশের নির্বিত্তদের স্বাধিকার-অর্জনের পথ। স্বাধীনতা-লাভের পরে, ক্রমবিস্তারী সমস্যার অব্যবস্থিত অবস্থার মধ্যে—যখন ভারতের জনগণের জন্য শান্তি ও প্রগতির পথ সন্ধান করা হচ্ছে—সেই গোড়ার দিকের বন্ধুত্ব ছিল সবে-শুরু-করা-হয়েছে কিছুটা এমন ধরনের। সেই বন্ধুত্ব বড়ো হতে হতে হয়ে উঠেছে—আবার বলা যাক—প্রকৃত "কালোত্তীর্ণ সম্পদ"।

১৯৭৩ সালের ২ অক্টোবর তারিখে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু-বার্ষিকীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলেছিলেন ; বলেছিলেন বিপুল অনুভব নিয়ে কিন্তু অত্যন্ত শান্ত ও সরলভাবে : "এই বিশ্বে কে বন্ধু আর কে বন্ধু নয় তা জানা যায়।" আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের কথা লেখা আছে যেন অনেকটা সূর্যকিরণের আখরে।

* * *

এই বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করতে হয় বিশেষ আবেগ নিয়ে, কেননা ামাদের বিশ্বে স্বাধীনতার জন্য যারা ভাবিত তারা সকলেই আজকের ন মাতৃভূমি রক্ষার মহান যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের জয়লাভের ৩০তম

বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। মাতৃভূমি রক্ষার যে যুদ্ধ ছিল হিটলার-জার্মানি এবং তার প্রকাশ্য ও অ-ঘোষিত মিত্রদের দ্বারা সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে হিংস্রভাবে ও সমগ্রভাবে নিক্ষিপ্ত ফ্যাশিবাদের দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে। আর ভারতে আমাদের মধ্যে অনেকেই, প্রচণ্ড লড়াই থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও, গভীরভাবে অনুভব করেছিল যে এ এক এমন রণক্ষেত্র যেখানে আমরাও শামিল। সোভিয়েত লালফৌজের সহায় ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, যা "সর্বশক্তিধর, কেননা তা সত্য"; আর এই সহায়ে বলীয়ান হয়ে সোভিয়েত লালফৌজ ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর মহান যুদ্ধে লড়াই চালাতে চালাতে তখনও-পর্যন্ত-সর্বত্র-বিজয়ী 'পান্‌ৎসার' বাহিনীর মহিমা চূর্ণ করে দিয়েছিল; আর একই বছরে শরৎকালে ও শীতের শুরুতে মস্কোর সামনে সংঘটিত অতি-ভয়ংকর সর্বাত্মক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল; আর এমনিভাবে, নির্মম যুদ্ধ যতোই চলেছিল ততোই অর্জন করেছিল মহাকাব্যতুল্য গৌরব। কে ভুলতে পারে লেনিনের শহরের সেই গরিমার কথা, যে শহর অবরুদ্ধ ও গুলিগোলায় বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও হাজার-দিন ধরে প্রতিরোধ করেছিল এবং অবশেষে এমন এক গৌরবে উদ্ভাসিত হয়েছিল যা কখনও ম্লান হবার নয়? কাকে না চমৎকৃত করবে স্তালিনগ্রাদের সেই কাহিনী, যাতে আছে সহ্যশক্তি মনোবল ও অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয়? কেউ কখনোও পারবে হিটলার-ফ্যাশিবাদের দ্বারা নিগড়বদ্ধ ইউরোপীয় জাতিসমূহের মুক্তিসাধনে অভিনন্দন না জানিয়ে থাকতে—যে মুক্তিসাধন ছিল বিশ্ব-স্বাধীনতার অগ্রবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের এক বিরাট ঐতিহাসিক কৃতিত্ব? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে অন্ধকার দিনগুলিতেও এই দেশ যথাসাধ্য (কেননা আমরা তখন স্বাধীন ছিলাম না) সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে—এ কি কম গৌরব! আর তারপরে, যথানিয়মে, বিশ্বের বিকাশমান ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আমাদের বন্ধুত্ব পরিণত হয়ে উঠেছে সর্বথা অভঙ্গুর এক রূপ নিয়ে।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এক নয়।

মৌল লক্ষ্যে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পথ হয়েছে পৃথক, আমাদের চলা প্রায়শই ভিন্নমুখী। নিজেদের সম্পর্কে হলেও আমরা এমন কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি না—যেমন বলেছিলেন, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, ফ্যাম ভ্যান দঙ, হাভানায় ১৯৭৪ সালের মার্চে, আবেগের সঙ্গে : "কিউবা ও ভিয়েতনামের ধমনীতে রয়েছে একই রক্ত—বিপ্লবের লাল রক্ত!" কিউবা ও ভিয়েতনাম ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে যে নাড়ীর সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্ত, আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তেমন নয়।

বছর কয়েক আগে ক্লেমেণ্ট গট্ওয়াল্ড প্রাগ্-এ এক ভাষণে যে কথাগুলি বলেছিলেন তা চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল বন্ধুর লক্ষ্যবাণী হয়ে উঠেছে: "আমরা সবসময়ে ও সর্বত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলব, এর অন্যথা হতেই পারে না।" ১৯৬৬ সালে হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্টদের নেতা ইয়ানোস কাদার সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির এক কংগ্রেসে এই মর্মে ঘোষণা করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সৌভ্রাত্র হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদের মৌল ও নীতিসম্মত মাপকাঠি এবং এমন কমিউনিজম কখনও থাকেনি, থাকতে পারে না, থাকবে না যা সোভিয়েত-বিরোধী। একই সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মহান হো চি মিনের ভিয়েতনাম শ্রমিক পার্টির নেতা লে দুয়ান বলেছিলেন, তাঁর আছে দুটি স্বদেশ; একটি নিজের, তার নাম ভিয়েতনাম—সে-দেশের মানুষ তিনি। অপরটি সোভিয়েত ইউনিয়ন, যেখানে সমাজতন্ত্রের জন্ম। আরও বলেছিলেন, সোভিয়েতের সঙ্গে থেকে তাঁরা প্রকৃতই "মার্কস ও লেনিনের সন্তান"।

যে বাতুলতা জনগণতন্ত্রী চীনের বর্তমান শাসকদের পেয়ে বসেছে তা যখন কাটবে—কাটতেই হবে, কেননা যতোই বিকৃতি ঘটুক, যতোই ক্ষতি ও বিলম্ব হোক, ইতিহাসের প্রকৃত গতিপথে কোনো বিরতি নেই—তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ১৯৬০ সালে সোভিয়েত নেতাদের

কাছে যে-কথা বলেছিলেন তা ইতিহাসে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠবে:
"চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিশারী মতাদর্শ হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, এই চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান মৈত্রীর মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মৈত্রী—প্রলেতারিয়েতের মৈত্রী, যে প্রলেতারিয়েত নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়েছে। এই কারণেই এই সম্পর্ক হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, তাকে ধ্বংস করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই। শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শত্রুরা বৃথাই চীনা-সোভিয়েত মৈত্রীকে ক্ষুণ্ণ করার এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে খণ্ডিত করার তুর্মদ স্বপ্ন দেখছে, এই স্বপ্ন কখনো সত্য হবে না।" (ওলেগ বোরিসভের 'ঐতিহাসিক বিচারে সোভিয়েত-চীনা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক,' নোভস্তি, মস্কো ১৯৭৪, গ্রন্থে উদ্ধৃত, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখের 'জেনমিন জিহ্‌পাও' থেকে)। সাম্প্রতিক অপ্রিয় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তিকে বিদ্রূপ মনে হতে পারে, কিন্তু মূলগতভাবে এই উক্তি অকাট্য ইতিহাসসম্মত। ইতিহাসের চাকার ঘূর্ণন কখনো-বা স্তিমিত হতে পারে, কিন্তু কখনোই থেমে যায় না।

কথাটা আরো একবার বলা যাক, ভারত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে সমাজতান্ত্রিক পরিবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের দরুন হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক ইতিহাসে নির্ধারক শক্তি—তুর্গহতা সত্ত্বেও, কিছু কিছু দুঃখজনক মতভেদ সত্ত্বেও। তবুও, ভারতে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা আনন্দের সঙ্গে ও আগ্রহের সঙ্গে লে তুয়ানের সুন্দর সত্যভাষণকে প্রতিধ্বনিত করবেন। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা গভীর অন্তঃস্থলে এই হচ্ছে ভিত্তি যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ভারত-সোভিয়েত মিত্রতা।

আমি যদি এখানে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করি তাহলে হয়তো সেটা অননুমোদনীয় বিবেচিত হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণ চলবার অন্ধকার সময়ে একদিন কলকাতায় বিশাল

একটি মিছিল দেখে বর্তমান লেখকের মনে একটি বাণী অনেকটা যেন প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, যে বাণী ছিল প্রকৃত শিখার মতো: 'আমার দেশ সোভিয়েত!' বর্তমান লেখক এই বাণীকে নিজের মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি, একটি প্রবন্ধ লিখেছিল যার শুরু এইরকম: "আমার দেশ সোভিয়েত। হ্যাঁ, আমার দেশ সোভিয়েত, যদিও অবশ্যই আমি ভারতীয়, প্রতি নখাগ্র পর্যন্ত ভারতীয়; এবং দেশপ্রেমিক, আশা করি অন্য কারও চেয়ে কম দেশপ্রেমিক নই। আমার কথাটা আরো একবার বললে বোধ হয় ভালো হয়। ভারতের প্রতিটি ঘাসের শিসকে আমি ভালোবাসি। ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে বেশি প্রিয় আমার জীবনে আর কিছু নেই। যে স্বাধীনতা আমাদের আপামর জনসাধারণের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা। যে জনসাধারণকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভোগ করতে হয়েছে জগতের দুঃখকষ্টে তাদের প্রাপ্যের চেয়েও প্রচুর বেশি। মাতৃভূমির প্রতি আমার সকল টান ও অপরাজেয় আনুগত্য নিয়েও আমি মনে করি সোভিয়েত ইউনিয়নও আমার দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষা করছে, আমি জানি, সমগ্র মানবজাতির সুখ ও ভবিষ্যৎ। সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমি অনুভব করি, এক জীবন্ত দুর্গ—যেমন আমাদের নিজেদের দেশ ভারতের, তেমনি নিপীড়িত ও ভারগ্রস্ত প্রত্যেকটি দেশের।" (দ্রষ্টব, 'মার্কসের পতাকাতলে', হীরেন মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৪৪, পৃঃ ২৩৬)

* * *

একথা যেন মুহূর্তের জন্যও ভাবা না হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও ভাবনা ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল কমিউনিজমের মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৎসহ গান্ধী, যিনি বিগত কয়েক শত বছরের মধ্যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান—তিনি কোনোক্রমেই সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। তবুও ১৯৩০ সালে মস্কো সফরের সময়ে (এ-বিষয়ে একটু পরেই আরো

কথা আসছে) হৃদয়ের পরিপূর্ণতা নিয়ে লিখেছিলেন "পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে···না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।" যখন তাঁর বয়স প্রায় আশি সেই সময়ে (১৯৪১) সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেটি তার অন্যতম শেষ গদ্যরচনা। 'সভতার সংকট' নামে এই প্রবন্ধে তিনি জ্বলন্ত ভাষায় সোভিয়েত কৃতিত্বের বিষয়ে বলেছিলেন। আর তাঁর আজীবন বন্ধু, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী পি সি মহলানবিশ 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' লিখেছেন, কবি মৃত্যু-শয্যা থেকেও (আগস্ট ১৯৪১) উদ্বেগের সঙ্গে নাৎসী-সোভিয়েত ফ্রণ্টে লডাইয়ের খবর জিজ্ঞেস করতেন এবং বলতেন যে দানবকে পরাজিত করতে পারে ও করবে একমাত্র সোভিয়েত।

জওয়াহরলাল নেহরু কোনো সময়েই কমিউনিজমের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু কুড়ির দশকের শেষদিক থেকে মুখ্যত তিনিই ছিলেন ভারতের মর্মবাণী, আর আবেগসঞ্চারী সেই বাণীতে ঘোষিত হত ফ্যাশিবাদ ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামের যোগসূত্রের কথা। একবার তিনি বলেছিলেন, স্পেনে কুখ্যাত ফ্রাঙ্কোকে মদদ দেওয়ায় পশ্চিমী "গণতন্ত্রগুলির" বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ভূমিকাকে "ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না।" সেই বাণীতে ধিক্কৃত হত ইতরতা ও পাপ, যাকে ফ্যাশিবাদ বলে চিনতেন। লখনৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) সভাপতির ভাষণে সোভিয়েতের "বিশাল ও মনোমুগ্ধকর কৃতিত্বের" কথা বলেছিলেন, আরও বলেছিলেন "ইতিহাসে গণতান্ত্রিক নীতির এমন বাস্তব প্রয়োগ আর কখনো হয়নি।" হিটলার যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জঘন্য যুদ্ধ শুরু করে তিনি তখন কারাগারে, সেখান থেকেই স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাঁর সামগ্রিক সহানুভূতি ও পক্ষাবলম্বন। বর্তমান লেখকের মনে আছে, তিনি ও আরো দুজন কমরেড কলকাতায় (জানুয়ারি ১৯৪২) জওয়াহরলাল

নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তৎকালে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সংগঠনের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল করার জন্য। ১৯৪২ সালে ব্রিটেনের ভণ্ডামিপূর্ণ নীতির পরিণামে—ব্রিটিশ, অবিলম্বে 'ভারত ছাড়' এই দাবির ভিত্তিতে—জাতীয় আন্দোলনকে সংগ্রামে উস্‌কিয়ে তোলা হয়েছিল, সেটা এই কারণে যে তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতার উল্লাসে জাজ্বল্যমান ভারত ফ্যাশিবাদ-বিরোধিতার বিশ্ব-শিবিরে সত্যভাবে ও প্রকৃতভাবে তার স্থান নিক। এমনকি কংগ্রেসকে যদিও ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিকে, যে ব্রিটেন ছিল অদৃষ্টপূর্ব জরুরি অবস্থার দরুন হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ—আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পক্ষ থেকে একথা স্পষ্ট করা হয়েছিল যে সোভিয়েতের উদ্দেশ্যসাধন এক অতি "মূল্যবান" বিষয় এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে সোভিয়েতের জয়লাভ সুগম হবে। তবুও ব্যাপারটার মধ্যে নিঃসন্দেহেই কিছু কিছু ঝুঁকি ছিল এবং জওয়াহরলাল নেহরু তৎকালে ভীষণ একটা মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটিয়েছিলেন। গান্ধী লিখেছেন, "আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার বিরুদ্ধে সে (জওয়াহরলাল) লড়াই চালিয়েছিল, এমন একটা আবেগ নিয়ে যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই," যতোক্ষণ-না তার নিজের প্রত্যয় হয়েছিল যে "সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত" যে সংগ্রামের কথা বলা হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ফ্যাশিবাদ-বিরোধিতার উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সহায়ক হবে।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম যে আন্তর্জাতিক ঝোঁকের সঙ্গে অলঙ্ঘনীয়ভাবে বিজড়িত, এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী যদিও এতটা গভীরভাবে সচেতন ছিলেন না তবুও নিজস্ব ধরনে ১৯২৮ সালে ব্যক্ত ধারণার প্রতি অনুরক্ত থাকতেন। ১৯২৮ সালে তিনি বলেছিলেন, "বলশেভিক আদর্শের পিছনে রয়েছে অসংখ্য পুরুষ ও নারীর শুদ্ধতম আত্মদান। এই আদর্শের জন্য তারা সবকিছু দিয়েছে। এই আদর্শ পবিত্রতা লাভ করেছে লেনিনের মতো সেরা মানুষের আত্মনিবেদনে। এই

আদর্শ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।" অতএব, সোভিয়েত যখন কার্যত একা হাতে বিশ্বের তৎকালীন দুর্ধর্ষতম যুদ্ধ-যন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল; রাতের তারার মতো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল সোভিয়েত যোদ্ধ্, বাহিনীর চরিত্র শুধ্ নয়, সমগ্র ও বিশাল ও অসম্ভবরকমের ক্লিষ্ট একটি দেশের নাগরিকদের চরিত্রও; ভারত তখন গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিল; এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ যেটুকু করার রাস্তা তার সামনে উন্মুক্ত ছিল—কেননা তখনো সে এমন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত যার কাছে সমাজতন্ত্র অভিসম্পাততুল্য—তাই নিয়েই সে চেয়েছিল সোভিয়েতের বিস্ময়কর সংগ্রামে বিধৃত মহান উদ্দেশ্যকে কথায় ও কর্মে সহায়তা করতে।

ভারতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুত্বের আন্দোলন সংগঠিত হতে শুরু করে—যদিও তখনো পর্যন্ত লভ্য সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে—২২ জুন ১৯৪১ তারিখের পরবর্তী সেই দগ্ধ দিনগুলিতে। এই তারিখেই সোভিয়েত এলাকায় তস্করের মতো প্রবিষ্ট হয়েছিল হীন কিন্তু সামরিক দিক থেকে বিপুল ফ্যাশিবাদের গুণ্ডাদল, এবং সোভিয়েত এলাকায় শুরু করে দিয়েছিল মৃত্যু ও ধ্বংসের মারাত্মক কর্মকাণ্ড। এই আন্দোলন কিন্তু আচমকা আকাশ থেকে খসে পড়েনি। পর-পর অনেকগুলো ঘটনা এই আন্দোলনকে তৈরি করেছিল। ঘটনাগুলো সংক্ষেপে হলেও বিবৃত করা দরকার।

দুই

একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে যে-দেশে রুশ সাম্রাজ্য অধিষ্ঠিত ছিল এবং বিপ্লবের আগুনে রূপান্তরিত হয়ে (১৯১৭) যে-দেশ হয়ে উঠেছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র সে-দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে আগে থেকেই বন্ধুত্বের অতি-বিশেষ কোনো ঝোঁক ছিল। ইতিহাসে আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকার মতো কোনো ব্যাপাব ঘটে না। আর, "প্রাচীনকালের ভারত-রুশ, ভারত-উজবেক, ভারত-আর্মেনীয় ও ভারত-তাজিক সম্পর্ক (গড়ে তুলেছে) এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য"—এই ঘটনাকে শুধু প্রসঙ্গত সম্পর্কিত করা চলে "আমাদের কালের ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের সুদৃঢ় ইমারতের" সঙ্গে। তবে একথাটি বেশ জোবেব সঙ্গে তুলে ধরা দরকার—সাম্রাজ্যবাদের 'বিশ্বব্যাপী শেকলে রুশী জারতন্ত্রেব দুর্বল কিন্তু অতিশয় জরুরি সংযোগটির যে ভাঙন ঘটিয়েছে লেনিন ও তাঁর পার্টি, সেটি মানুষের ইতিহাসে শুধু মহত্তম নয়, সর্বাধিক আনন্দেরও ব্যাপার। মুখে "মার্কসবাদ" বলে এমন কোনো কোনো পশ্চিমী মহল অন্তহীন বিলাপ করে চলেছে, কেননা কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী নাকি মিথ্যা প্রমাণিত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল পশ্চিম ইউরোপে নয়, শিল্পগতভাবে কম অগ্রসর রুশদেশে! ধরা যাক আইজাক ডয়েট্শার জাতীয় কোনো ব্যক্তির কথা, যিনি কিছুতেই ইতিহাসের রায় মেনে নিতে পারছেন না, তাই অনবরত প্রচার করে চলেছেন—সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের "আদি পাপ" বিশ্বের একটি পশ্চাদপদ অংশে তার সংঘটন, যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবের এখনো জন্ম হতে বাকি, এবং তা হতে পারে একমাত্র পশ্চিমী

দেশগুলিতে, কেননা, ধরে নেওয়া হচ্ছে, "গণতন্ত্রের" সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে যুক্ত করার ক্ষমতা আছে একমাত্র এই পশ্চিমী দেশগুলিরই! তবে, যেহেতু জন্মগতভাবে সমৃদ্ধ "পশ্চিমী" দেশগুলি বিপ্লব উৎপন্ন করেনি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে যখন বিপ্লবের বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠেছিল তখন তারা অসমর্থ ও ব্যর্থ হয়েছে, অথচ "পশ্চাৎপদ" রাশিয়া হয়নি, অতএব "পশ্চিম"-এর কখন বিপ্লব করার মর্জি হবে সেই অপেক্ষায় ইতিহাস বসে থাকতে পারে না। ইতিমধ্যে বিশ্ব এগিয়ে গিয়েছে, মনুষ্যজাতির একাংশ এখন বাস করে সমাজতন্ত্রে, আর তাদের মধ্যে যে প্রথম-জাত সেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে সেলাম জানাতে তারা অভিন্ন।

ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে ছড়ানো এই দেশ, যার ভূখণ্ডের আয়তন ভূ-গোলকের এক-ষষ্ঠাংশ, যেখানে বাস করে সামাজিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরে স্থিত ন্যূনাধিক দুইশত জাতি-অধিজাতি, যাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে বৃহৎ টাকার শাসনাধীন বাকি বিশ্বের বিষাক্ত বিরোধিতার—সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহসের সঙ্গে প্রায় অসম্ভব মাত্রার ঐতিহাসিক কর্তব্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ও মোকাবিলা করেছে। তা যে করতে পেরেছে তার প্রধান কারণ, তার লেনিনবাদী নেতৃত্ব—যে নেতৃত্ব ছিল জাতিদম্ভের অনায়াস সংক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যে অনুভব করত ও ভাগ নিত জারতন্ত্রী "জাতিসমূহের কারাগারের" জীবনে নিপীড়িত এশীয় ও অন্যান্য জাতিগত গোষ্ঠীর যন্ত্রণা, যে মহান লেনিনের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিল কেমনভাবে, প্রকৃত মার্কসবাদী বিচারে, সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই ও জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই সম্পূর্ণ সমন্বিত হতে পারে। আর এমনিভাবে সে সারা বিশ্বের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উদ্ভূত হয়েছিল স্বাধীনতার দিকে ও সমগ্রভাবে মানবতার পরিপূর্ণতার দিকে জাজ্বল্যমান লাল পথরেখা হিসেবে—"অগ্রগতির" বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত "পকেট" হবার জন্য নয়। এখানে একথা স্মরণ করা ভালো যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কস ও এঙ্গেলস ইউরোপ-কেন্দ্রিকতার বিপদের বিরুদ্ধে

সতর্কবাণী উচ্চারণ করার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। বলেছিলেন (১৮৫৩), বিপ্লব যদি হয় কেবল ইওরোপে, "এই ক্ষুদ্র কোণে", তাহলে তা "অনিবার্যভাবেই নির্মূলীকৃত হবে…কেননা বুর্জোয়া সমাজের আন্দোলন এখনো পর্যন্ত অতি ব্যাপক এলাকা জুড়ে উর্ধ্বমুখী"— এশিয়ায় সাম্রাজ্যের উল্লসিত বধ্যভূমিতে এবং অন্যত্র। ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে এঙ্গেলস এমনকি একথা লিখতেও ইতস্তত করেননি যে: "ভারতে হয়তো—প্রকৃতপক্ষে, খুব সম্ভবত— বিপ্লব হয়ে যাবে…(তা হবে) **আমাদের পক্ষে** অতি অবশ্যই সবচেয়ে ভালো ব্যাপার।" (মোটা হরফ এঙ্গেলসের) তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী— যার পক্ষে প্রভূত সাক্ষ্য রয়েছে, যা এখনো ভারতীয় মহাফেজখানায় অব্যবহৃত—বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু কথাটা তা নয়। আসল বিষয় হচ্ছে, ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা এবং বিশ্বের প্রকৃত সমাজ-তান্ত্রিক স্বাধীনতার মধ্যে অব্যাহত পরস্পর-সম্পর্ক—মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের মনে যা ছিল এবং লেনিন সবসময়ে যা মনে রেখেছিলেন। ঠিক এই কারণেই লেনিন একসময়ে এমনকি একথাও বলেছিলেন যে তাঁর কাছে ভারত হচ্ছে "প্রাচ্যদেশে বিপ্লবের পীঠস্থান"। তাই দেখা যায়, ১৯০০ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে লেনিন অক্লান্তভাবে ব্যাখ্যা করে চলেছেন সমাজতন্ত্রের জন্য মৌল সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের তাৎপর্য। এ-কারণে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা-বাদীর পতাকায় লেনিন-ই খোদিত করে দিয়েছিলেন মতান্ধরা-হজম-করতে-পারেনি এমন একটি আওয়াজ: "সকল দেশের ও সকল নির্যাতিত জাতির মজুররা এক হও!" এ-কারণে সোভিয়েত বিপ্লবের মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের সর্বত্র এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীনতম নিগড় এশিয়া মহাদেশে জনগণের সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব-স্থাপন।

* * *

আগেকার কালের ভারত-রুশ সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ পর্যালোচনা

করার জন্য এই রচনা নয়। কিন্তু পরবর্তীকালের ভূমিকা হিসেবে আগেকার কালের কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনা স্মরণ করা চলে। ভাস্কো দা গামার নাম করা হয় প্রাচ্যে পাশ্চাত্ত্য আধিপত্যের প্রথম অগ্রদূত হিসেবে। কিন্তু তারও পঞ্চাশ বছর আগে আরো একজন ভারতে এসেছিলেন যাঁর নামের সঙ্গে "নিকৃষ্ট জীবদের" শাসন করার ব্যাপারে সাদা মানুষের পবিত্র অধিকার সম্পর্কিত কথাবার্তা বিন্দুমাত্র জড়িত নয়। তিনি হচ্ছেন ৎভের-এর রুশ বণিক আফানাসি নিকিতিন। ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি পর্যটন করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতের জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে প্রথমশ্রেণীর একটি বই লেখেন। ১৫৩৩ সালে মস্কোয় একজন দূত উপস্থিত হন এবং এই বলে নিজের পরিচয় দেন যে তিনি প্রথম মহামোগল বাবরের দ্বারা প্রেরিত। এই ঘটনায় দুই দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যিক যোগাযোগের বিষয়টি পরিদৃষ্ট। তবে এ-দেশে রাশিয়ার প্রথম শান্তি-দূত হিসেবে নিকিতা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

সেই সপ্তদশ শতাব্দীতেই যে ভল্‌গা অববাহিকায় আস্ত্রাখানে ভারতীয় বণিকদের বসতি ছিল সে-সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ আছে। তাদের সাময়িক নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল মনে হয়, তারা যে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময়ে রুশ যুদ্ধ তহবিলে অর্থসাহায্য করেছিল তার ব্যাখ্যা এই। স্থলপথে ভারতে যাতায়াতের পথ নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে রাশিয়ার জাররা সঙ্গত কারণেই ব্যগ্র ছিলেন। মনে হয় বহু দুরূহতা অতিক্রম করার পরে তবেই জারের একজন দূত ১৬৯৬ সালে দিল্লিতে পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। এই রচনায় বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নেই, কিন্তু একথা মনে রাখা ভালো যে অন্ততপক্ষে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে, অর্থাৎ কুশান যুগ থেকে, ভারত ও প্রাচীন রুশ সাম্রাজ্যের মধ্য এশীয় অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ, এবং এই কাহিনীতে উল্লেখ্য অধ্যায় যুক্ত হয়েছে 'আল্ হিন্দ' ('ইণ্ডিকা')-এর প্রণেতা সর্বজ্ঞ পণ্ডিত আল্

বেরুনি (খ্রীষ্টাব্দ ৯৭৩-১০৪৮)-র এবং আবত্বর রাজ্জাক সমরখন্দী-র ভারত সফরের ফলে। ভারতীয় চেতনার প্রায় অঙ্গীভূত অংশ হয়ে রয়েছে বুখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দ ও খিভা। অন্যদিকে 'রুস' পাল্টা আগ্রহ দেখিয়েছে, প্রাচীন রুশী লোকসঙ্গীতে রয়েছে ভারতীয় বিষয়ের প্রচুর উল্লেখ। এমনভাবে যা থেকে বোঝা যায় এই তুটি দেশ আদৌ পরস্পরের অপরিচিত হতে পারে না। সেই পঞ্চম শতাব্দী থেকেই আর্মেনীয় বণিকরা ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তৎপর ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে কলকাতায় বসতি স্থাপন করে। তাদের এখনো সেখানে দেখতে পাওয়া যায়, যদিও অবশ্যই এরিভান থেকে অনেক দূরে—কিন্তু আমাদের তুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়ক, অন্ততপক্ষে সম্ভাবনাপূর্ণ তো বটেই।

এমনিভাবে ভারতের কাছে রাশিয়ার "ভাবমূর্তি" ছিল বন্ধুর ভাবমূর্তি, কিন্তু অন্যদিকে "রুশী জুজুর" একটা মূর্তি খাড়া হয়ে উঠেছিল মধ্য এশিয়া নিয়ে ইংরেজ-রুশ রেষারেষি এবং সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ও উচ্চাশার দ্বন্দ্বের ফলে। ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট উত্তর-পশ্চিমে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে রুশী বিঘ্নকে প্রতিহত করার অজুহাতে সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করেছিল, যাকে বলা হয়, "সম্মুখ নীতি"। এমনকি সেই ১৮৯১ সালেই, নরমপন্থী হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস এই নীতির বিরোধিতা না করে পারেনি। তুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে কিছুটা অস্বস্তিকর এক অ্যাংলো-রুশ চুক্তি (১৯০৭) খাড়া করেছিল। চুক্তিতে যদিও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তৎকালীন পারস্যে (বর্তমান ইরানে) প্রভাবের এলাকা, কিন্তু আফগানিস্তানের অবস্থানের সমস্যাকে অনিশ্চিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতকে অনবরত বলা হচ্ছিল যে রাশিয়া সবসময়েই দক্ষিণ দিকে ঠেলা দিচ্ছে, রাশিয়া চায় সমুদ্রে নির্গমনের পথ এবং সেই সঙ্গে সম্ভবত খোদ ভারতকেও। জার চলে যাবার পরে

ভারতকে আরো ভয় দেখিয়ে এমনকি এ কথাও বলা হতে লাগল যে তার পক্ষে আশঙ্কার কারণ হচ্ছে সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদ। সুখের বিষয়, ১৯১৯ সালের কাছাকাছি সময়ে জাতির নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী আবির্ভূত হন এবং খোলাখুলি বলেন যে "রুশী জুজুতে" তাঁর আদৌ বিশ্বাস নেই।

কোনো কোনো ভারতীয় নৃপতি—পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা যাদের বশে এনেছে—বিজেতার প্রতি তাদের ঘৃণা থেকে কিছু সময়ের জন্য জারতন্ত্রী রশিয়ার দিকে সাহায্যের জন্য তাকিয়েছিল। প্রথমে ১৮৬৫ সালে এবং পরে আবার ১৮৭০ সালে কাশ্মীরের মহারাজা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, বলা বাহুল্য, তিনি প্রত্যাখাত হন। জারতন্ত্রী "ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার পাহারাদার" এমন খোলাখুলি তার শ্রেণী-স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে তা আশা করা যেত না। 'নামধারী' শিখদের প্রতিনিধি গুরুচরণ সিং গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে। তিনি ভোলেন নি যে তাঁদের মধ্যে সেরা কয়েক-জনকে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য শাস্তি হিসেবে ব্রিটিশদের কামানের গোলায় প্রাণ দিতে হয়েছিল। দুর্গম ও কষ্টকর পথ পার হয়ে ১৮৭৯ সালে তিনি হাজির হয়েছিলেন জারের কাছে এবং সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ভারতের শত্রুর শত্রুর কাছে কোনো জন-প্রতিনিধির সাহায্য প্রার্থনা এই প্রথম। এই প্রার্থনাও নাকচ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতের জনগণের মনোভাবই ছিল এমন যে নিয়মিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৮৭৯ সালের ১৮ মে তারিখে যখন রুশী যুদ্ধজাহাজ বোম্বাই বন্দরে এসে হাজির হল তখন মানুষের ভিড় জমে গেল জাহাজঘাটায়। এবং লোকে বলাবলি করতে লাগল যে "ব্রিটিশ জোয়াল খসে পড়ল বলে, আর তা খসাচ্ছে রাশিয়া ও নানা সাহেব (১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ খ্যাত)।" এমন কথাও শোনা যায় যে মহান ভারতীয় নেতা তিলক ১৯০৫ সালে বোম্বাইয়ের রুশ কনসালের কাছে গোপনে খোঁজ নিয়েছিলেন ভারতীয়দের

সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারে এবং ভারতে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করার যন্ত্রপাতি পাবার ব্যাপারে রুশের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা রুশী "নিহিলিস্টদের" ও নানা বর্ণের অ্যানার্কিস্টদের কার্যকলাপ দেখে ভারতে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হত। কোনো যুক্তি নেই, তবুও রাশিয়া ও আয়র্ল্যাণ্ড এই দুটি দেশের দিকে উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারতের রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীরা তাদের আশা জীইয়ে রাখার জন্য অনেক আবেগ নিয়ে তাকাত।

অন্যদিকে গেরাসিম লেবেদভের কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞ ও নাট্যকার, ভারতে বাস করেছিলেন ১৭৮৫ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত। পরবর্তী কালে তাঁকে বলা হত রুশী ভারতবিদ্যার জনক। ভারতের রচনাবলী তিনি রুশভাষায় অনুবাদ করেন, ভারতের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন, এবং ভারতের বহু ভাষা শিখে নিয়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রশংসাসূচক মূল্যায়ন করেন। কলকাতায় থাকার সময়ে বাংলায় নাটক লেখেন ও সেই নাটক মঞ্চস্থ করেন। ইউরোপীয় কলাকৌশল আশ্রয়ী নাটকের অভিনয় ভারতে এই প্রথম। তিনি ছিলেন পথিকৃৎ যাঁর স্মৃতি ভারতে এখনো গভীরভাবে লালিত। ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য রুশভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কারামজিনের কথা উল্লেখ করা চলে, তিনি বলেছিলেন, "কালিদাস আমার কাছে হোমারের মতো মহান।" প্রখ্যাত রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী বেলিনস্কি বলতেন, ইতিহাসে সম্মানজনক স্থান পাওয়া উচিত ভারতের।। নল-দময়ন্তীর কাহিনী তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, যেটি মহাভারত থেকে অনুবাদ করেছিলেন জুকোভস্কি। চের্নিশেভস্কির ছিল ভারতীয় কৃষকদের সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ। নৃতত্ত্ববিদ মিক্লুখো মাক্লাই-এর (১৮৪৬-৮৮) মতে সায় দিয়ে তিনিও বিশ্বাস করতেন যে সব জাতি সমান। পাঞ্জাবী কুকাদের (ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী) ও বাঙালী বুদ্ধি-জীবীদের সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছিল বন্ধুত্ব করার ও সাড়া দেবার

ক্ষমতা তাদের আছে। দোব্রোলিউবভ মনে করতেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল "ইতিহাসের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত।" এবং জোর গলায় বলতেন যে "ভারতে ব্রিটেনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত স্তরে মুনাফা করা"। ছিলেন সাল্‌তিকভের মতো শিল্পী যিনি ভারতীয় জীবনের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক নিয়ে ছবি এঁকেছেন, কিংবা তার চেয়েও বেশি। ভেরেশ্‌চাগিনের সেই ছবি তো বিখ্যাত হয়ে আছে, যাতে তিনি এ কেছিলেন ১৮৫৭-৫৮ সালের ব্রিটিশদের ছবি—সিপাহীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তাই কামান দেগে ব্রিটিশরা বর্বরের মতো ভারতীয় সিপাহীদের উড়িয়ে দিচ্ছে। এই ছবি, যাকে বলা চলে প্রোথিত হওয়া, তাই হয়েছে—ঠাঁই নিয়েছে পরাধীন ভারতের আহত আত্মার গভীরতম কন্দরে। পৃথক এক মণ্ডলে অধিষ্ঠান করে কাজ করে গিয়েছেন শিল্পী রোয়েরিক (জন্ম ১৮৭৪ সালে), এঁকেছেন হিমালয়ের ভূদৃশ্যের অজস্র ছবি, ক্যানভাসের ওপরে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সেই শান্তি যা অনুভব্য।

* * *

ভারতের বুদ্ধিজীবীদের গভীরভাবে টেনেছিলেন উনিশ শতকের রাশিয়ার বিরাট লেখকেরা—যথা, গোগোল, দস্তয়েভস্কি, চেখভ, তুর্গেনেভ, এবং সর্বোপরি তলস্তয়। শেষোক্ত জনের সামাজিক চিন্তা এবং ক্লিষ্ট জনগণের জন্য যন্ত্রণা, তদুপরি বিপুল সাহিত্যিক সৃজনশীলতা এ-দেশকে বিমোহিত করেছিল—তার প্রমাণ রয়েছে ইয়াসনায়া পলিনায়া সংগ্রহশালায়, গান্ধী ও অন্যান্য প্রখ্যাত ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের মধ্যে। ১৯০৯ সালে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পত্র লিখেছিলেন তলস্তয়ের কাছে এবং নিজের পত্রিকায় মহান লেখকের 'একজন হিন্দুর কাছে পত্র' প্রকাশ করেছিলেন। গান্ধী তাঁর পত্রে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতি-বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আইন-অমান্য আন্দোলনের পদ্ধতি

রচনায় তলস্তয়ের কাছে তার ঋণের কথা। লক্ষ করার বিষয়, গান্ধী তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার পর্বে রাশিয়ার দিকে এতই আকর্ষিত হয়েছিলেন যে তাঁর লেখায় ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব সম্পর্কে এবং রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের সাধারণ ধর্মঘটী আন্দোলন সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয় গান্ধী মনে করতেন রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের সাধারণ ধর্মঘটী আন্দোলন ভারতীয়দের কাছে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। এখানে এই আলোচনায় যাবার প্রয়োজন নেই যে গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল দ্বিধাবিভক্ত—তিনি একাধারে ছিলেন একদিকে ধর্মীয় পুনর্জাগরণপন্থী, অন্যদিকে প্রকৃত এক গণ-আন্দোলনের প্রেরণাদাতা ও নেতা। এ-ঘটনা বিশেষ অর্থবহ যে ১৯২২ সালে লেনিন তার একটি শেষ অসমাপ্ত রেখাচিত্রে লিখেছিলেন: "তুটি ফ্রন্ট ও মধ্যপথ; হিন্দু-তলস্তয়পন্থী"। সোভিয়েত গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে গান্ধীকে উদ্দেশ করে এই নামকরণ। তাঁর অতি-ব্যস্ততার মধ্যেও অতুলনীয় বিপ্লবী অভিজ্ঞান দিয়ে তিনি ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিতে পারতেন এবং দিয়েছিলেন। এমন-ভাবে দিয়েছিলেন যার কোনো তুলনা নেই।

ম্যাক্সিম গোর্কির নাম ভারতে যতোখানি সম্মানিত এমন অন্য কোনো বিদেশী নাম নয়। ১৯৩৬ সালে ম্যাকসিম গোর্কির মৃত্যুতে ভারতে দেশব্যাপী এমন এক আবেগ সৃষ্টি হয় যা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের আতঙ্কিত করে তোলে। ভারতের প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গঠনের মধ্যে (দেশের সর্বত্র গোর্কি স্মৃতিসভা অনুষ্ঠানের ডাক দিয়েছিল সঙ্ঘ, দেশের মানুষের কাছে এই ছিল সঙ্ঘের প্রথম ডাক) ব্রিটিশ শাসকরা দেখেছিল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের অগ্রগতির এক শক্তিশালী লক্ষণ। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার কালেই গোর্কি ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংস্পর্শ রেখে চলতেন, জোরালোভাবে লিখেছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সমর্থনে যাঁকে বহিঃ-সমর্পণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নীতি সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে দীর্ঘ কারাদণ্ড

দেওয়া হয়েছিল, পত্রালাপ করতেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে যিনি প্যারিস থেকে 'ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন এবং সেই পত্রিকায় তদ্বিষয়ক লেখাপত্র পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন, পত্র-বিনিময় করতেন তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বিপ্লবী মাদাম কামা-র সঙ্গে যিনি গোর্কির 'ঝোড়োপাখির গান' পড়ে আনন্দের অশ্রু ফেলেছিলেন এবং খুশির সঙ্গে বলে উঠেছিলেন যে এই কবিতায় স্তলস্তয়ীয় দুর্জ্ঞেয়তা নেই এবং এই কবিতা জ্বলন্ত তরবারির মতো যা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্যবহৃত হতে পারে। কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে মাদাম কামা-র তফাৎ ছিল, মাদাম কামাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল রাশিয়ার ১৯০৫ সালের বিপ্লব এবং সেই বিপ্লবের প্রেরণা মার্কসবাদী মতাদর্শ। বস্তুতপক্ষে তিনি ব্রাসেল্‌স-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় (সমাজতান্ত্রিক) আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে (১৯০৭) যোগ দিয়েছিলেন, লেনিন ও লীব্‌ক্‌নেক্‌ট ও রোজা লুক্‌সেমবুর্কের কথা শুনেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে এই মানুষগুলো কংগ্রেসে আধিপত্যকারী সুবিধাবাদীদের মতো নয়, তাঁরা প্রকৃতই সর্বক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এবং স্বাধীনতার পরীক্ষিত বন্ধু ও মিত্র। সব কথা এখনো পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি, কিন্তু পাভলোভিচ ও চিন্মোহন সেহানবীশের গবেষণা থেকে মনে হয় এই স্মরণীয় মহিলাই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি কমিউনিজমের 'ভেল্‌ট্‌আন্‌শাউয়ুঙ্ক' (দর্শন) গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে গোর্কিরও অবশ্যই অবদান থাকার কথা; এটা একটা **ঘটনা** যে আরো অনেক পরবর্তী কালে কারাগারের মধ্যে গোর্কির 'মা' পাঠ শত শত বাঙালী সন্ত্রাসবাদীকে কমিউনিজমের মতাদর্শে বিশ্বাসী করে তুলতে বড়ো রকমের সহায়তা করেছে।

আই পি মিনায়েভ (১৮৪০-৯০) ছিলেন একেবারে অন্যধরনের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। তিনবার তিনি ভারত পরিদর্শন করেছিলেন—১৮৭৪-৭৫ সালে, ১৮৮০ সালে ও ১৮৮৫-৮৬ সালে—তিনবারই দেখা গিয়েছিল

জনগণের জীবন সম্পর্কে তাঁর বিস্তীর্ণ ও জাগ্রত আগ্রহ। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৫) তিনি যোগ দিয়েছিলেন; কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে ডায়েরিতে লিখেছিলেন যে জাতীয় ঐক্যসাধনের দিকে এই হচ্ছে এক সম্ভাবনাপূর্ণ অগ্রগতি এবং একই সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন যে আন্দোলনের চরিত্র আবেদন-নিবেদন-মুখী (ঠিক বিপ্লবী নয়); ফাড়কে-র নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মারাঠা কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৪) সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতৃস্থানীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ও আর জি ভাণ্ডারকরের মতো পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল ভারতের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক-দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। বঙ্কিমকে তিনি নিজের রচনাবলী উপহার দিয়েছিলেন এবং বঙ্কিমের স্বাক্ষরিত বাঙলা রচনা উপহার পেয়েছিলেন। শেষোক্ত নিদর্শন এখনো লেনিনগ্রাদে দেখা যেতে পারে। সম্ভবত একথাও উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৯ সালে তাঁর বিখ্যাত 'সাম্য' বিষয়ক প্রবন্ধটি রচনা করেন এবং তাতে তিনি কমিউনিজম ও প্রথম আন্তর্জাতিকের উল্লেখ করেন। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, এখনো পর্যন্ত যাঁর পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায়নি কলকাতার সেই পত্রলেখকের কথা, যিনি কলকাতায় একটি শাখাকে অনুমোদন দেবার জন্য প্রথম আন্তর্জাতিকের কাছে পত্র দিয়েছিলেন এবং যাঁর সেই পত্র নিয়ে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সভায় (১৫ অগস্ট ১৮৭১) আলোচনা হয়েছিল। আরো স্মরণ করা চলে রেভারেণ্ড জেমস লঙের ভূমিকা। তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে আইরিশ কিন্তু বহুকাল রাশিয়ার অধিবাসী, বাংলায় সকল শ্রমজীবী জনগণের বন্ধু, নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত নীলচাষীদের সক্রিয় মুখপাত্র, মিনায়েভের ও তৎসহ সকল সমকালীন বাঙালী র‍্যাডিকালের বন্ধু। তাঁর নাম এ-দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, কিন্তু তাঁর বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে তাঁকে জানার চেষ্টা এদেশে

পুরোপুরি হয়নি—তিনি ও "তৎসহ মিনায়েভ ছিলেন ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সেতু"।

মিনায়েভের সমসাময়িক পি আই পাশিনো ভারত পরিদর্শন করেছিলেন ১৮৭৩ সালে, এবং পুনরায় ১৮৭৪-৭৫ সালে। তিনি লক্ষ করেছিলেন অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ। মস্কোর এক প্রখ্যাত মনীষী, এম এম কোভালেভ্স্কি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় গ্রাম্য সমাজ সম্পর্কে লিখেছিলেন এবং কার্ল মার্কসের প্রশংসা লাভ করেছিলেন। লেবেদভ ও মিনায়েভের মতো ব্যক্তিরা রুশী ভারতবিদ্যার যে প্রকৃত জীবনমুখী ঐতিহ্য স্থাপন করে গিয়েছেন পরবর্তীকালে তা অব্যাহত থেকেছে এস এফ ওল্ডেনবুর্গ ও এফ আই শ্চেরবাৎস্কির হাতে। ইতিমধ্যে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শোনা গিয়েছে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ভূগোলবিদ আন্দ্রেই স্নেসারিয়ভ-এর (জন্ম ১৮৬৫) নামে উৎসর্গীকৃত একটি সম্প্রতি-প্রকাশিত বইয়ের কথা। আন্দ্রেই স্নেসারিয়ভ থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারাটা অবশ্যই আনন্দের বিষয়: "ভারতীয়রা কল্পনাপ্রবণ, সহৃদয় ও অনিসন্ধিৎসু মানুষ। উদ্ধত ইংরেজরা তাদের বলে যে তারা (ব্রিটিশরা) এ-দেশে শৃঙ্খলা এনেছে এবং রেলপথ নির্মাণ করেছে। কিংবা, তারা শুধু 'কাজ করেছে ভারতের উপকারক হিসেবে'। তারা ভুলে গিয়েছে যে তারা এ-দেশ লুণ্ঠন করেছে, এ-দেশের মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে, যে-স্বাধীনতা যে-কোনো প্রগতির অপরিহার্য শর্ত। যে-দেশের মানুষ ব্যাকরণের মূলসূত্র প্রণয়ন করেছে, সৃষ্টি করেছে মহাভারত ও রামায়ণের মতো মহাকাব্য, বিশ্বকে দিয়েছে সংখ্যা ও স্বরলিপি, সে-দেশের মানুষের প্রতিভা ও কল্পনার প্রসারকে খাটো করে দেখা কেমন করে সম্ভব?… ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন হচ্ছে বিদেশীদের লুণ্ঠনকারী বাণিজ্য নির্বাহ, এই বিদেশীরা মনে করে যে তাদের শাসনাধীন মানুষগুলি হচ্ছে বুদ্ধিগত-ভাবে নীতিগতভাবে ও শারীরগতভাবে নিকৃষ্টতর জাতি।…" অধিকাংশ পশ্চিমী পণ্ডিত প্রাচ্যকে মনে করেন কিম্ভূত ও কিমাকার, তাই তাঁদের

দ্বারা প্রচারিত ভারতবিদ্যা থেকে সোভিয়েত ভারতবিদ্যা যে এত পৃথক তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আর আজ যখন লেলিনগ্রাদের কালিয়ানভ সমাদরের সঙ্গে মহাভারত অনুবাদ করছেন এবং মস্কোর গুসেভা সোভিয়েত নাগরিকদের অন্তহীন প্রবাহকে অপরিসীম আনন্দ দিয়ে ব্যালেনৃত্যে রামায়ণ মঞ্চস্থ করছেন তখনো অবাক হবার কিছু নেই।

* * *

প্রথম রুশ বিপ্লব (১৯০৫) এবং জাপানের হাতে জারের পরাজয়ে গণ-আন্দোলনের মুখ খুলে গেল এবং বহু দেশে সত্যিকারের গণ-জাগরণ ঘটতে শুরু করল। বিপ্লব দেখা দিল পারস্যে (১৯০৬), তুর্কীদের ওটামান সাম্রাজ্যে (১৯০৮), চীনে (১৯০৭ ও আরও বৃহত্তর আকারে ১৯১২ সালে)। ১৯০৫ সালে ভারতে শুরু হল মুক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে এমন এক ধরনের আন্দোলন যেমনটি আগে কখনো হয়নি। তৎকালে মার্কুইস কার্জন ছিলেন ভারতের বড়লাট, তিনি গর্বের সঙ্গে ভারতের অধিকারকে তুলে ধরেছিলেন ব্রিটেনের রাজমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন হিসেবে, এমনকি একটি সরকারি পত্রও লিখেছিলেন যাতে তুলনা টেনেছিলেন জারতন্ত্রের সামনে যে বিপদ দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে ভারতের একই ধরনের স্বৈরতন্ত্রের সামনে উপস্থিত একই ধরনের বিপদের সঙ্গে। দেশের অসন্তোষ বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল মহারাষ্ট্রে, বাংলায় ও পাঞ্জাবে, বিভিন্ন অসন্তোষের কেন্দ্রমুখটি হয়ে উঠেছিল, যাকে বলা হয়, বাংলা-বিভাগ। তা এমন এক গণ-প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছিল যার বিচার করতে গিয়ে মহান মার্কসবাদী লেখক আর পাম দত্ত বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এটি হচ্ছে প্রথম পর্ব।

'ভারতীয় মত' নামক যে পত্রিকা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রকাশ করতেন শুধু তাতেই নয়, ভারতের একজন মহত্তম সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরাজী মাসিক 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ও তার বাংলা প্রতিরূপ 'প্রবাসী' পত্রিকাতেও ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব

সম্পর্কে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। লেনিন ও তাঁর পার্টি সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানতেন না, কেননা এমনি মহল থেকে কোনো খবর এসে পৌঁছবার পথ ভারতে ভালোরকম নিশ্ছিদ্রভাবেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা জানতেন ম্যাকসিম গোর্কিকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে পিটার ও পলের কুখ্যাত দুর্গে এবং তাঁরা ম্যাকসিম গোর্কির মুক্তি দাবি করেছিলেন। অনেকদিন পার না হওয়া পর্যন্ত কেউ-ই জানতেন না—না তাঁরা, না তাঁদের দেশবাসীরা—যে রাজদ্রোহের অপরাধে তিলকের যখন ছ-বছর কারাদণ্ড হয় এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বোম্বাইয়ে ছ-দিন ব্যাপী অসাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট হয়, সে-সম্পর্কে লেনিন ১৯০৮ সালে লিখেছিলেন:

"ভারতে 'সভ্য' বিটিশ পুঁজিবাদীদের নেটিভ দাসরা সম্প্রতি তাদের প্রভুদের পক্ষে প্রভূত বিরক্তি ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।... ব্রিটেনে যারা সবচেয়ে উদার ও সবচেয়ে র‍্যাডিকাল রাষ্ট্রনেতা—যথা, জন মোরলি—তারাও...ভারতের শাসকরূপে হয়ে উঠছে চেঙ্গিস খান, নিজেদের অধীনস্থ মানুষদের 'শান্ত করার জন্য' তারা যে-কোনো ব্যবস্থা অনুমোদন করতে পারে, এমনকি রাজনৈতিক প্রতিবাদীদের **বেত্রাঘাত** পর্যন্ত। ক্ষুদে ব্রিটিশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সাপ্তাহিক 'জাস্টিস'-এর প্রচার ভারতে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে জন মোরলির মতো উদার ও 'র‍্যাডিকাল' বজ্জাতরা। আর যখন স্বাধীন লেবর পার্টির নেতা ও পার্লামেন্ট-সদস্য কেইর হার্ডি ভারতে যাবার এবং নেটিভদের সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রাথমিক দাবি নিয়ে আলোচনা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন তখন গোটা ইংরাজী সংবাদপত্র-জগৎ 'বিদ্রোহীর' বিরুদ্ধে সোরগোল তুলেছিল।...কিন্তু ভারতীয় জনতা তাদের স্বদেশীয় লেখক ও রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থনে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। ইংরেজ শৃগালরা ভারতীয় গণতন্ত্রী তিলককে ঘৃণ্য দণ্ড দিয়েছে...টাকার থলির আজ্ঞাবাহকদের পক্ষ থেকে একজন গণতন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কার্য করা হয়েছে—তার ফলে বোম্বাইয়ে জেগে উঠেছে রাস্তায় রাস্তায়

বিক্ষোভমিছিল ও ধর্মঘট আর ভারতীয় প্রলেতারিয়েতও ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ও শ্রেণী-সচেতন গণ-সংগ্রাম চালনা করার মতো যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। আর এই যখন ঘটনা, ভারতে অ্যাংলো-রুশ পদ্ধতির আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ইউরোপের শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকরা এখন এশিয়াতেও কমরেড পেয়েছেন আর এই কমরেডদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলবে।"

উদ্ধৃতি বড়ো করেই দেওয়া হল, কেননা এই উদ্ধৃতিতে ইতিহাস কথা বলছে। সেই ইতিহাস যার রচনায় লেনিন ও লেনিনবাদ মহত্তম অবদান রেখেছে। সেই ইতিহাস যার মধ্যে দিয়ে ভারতের স্থান লেনিনের গড়া সোভিয়েতের পাশটিতে।

তিন

১৯১৭ সালের নভেম্বরে 'ত্বনিয়া কাঁপানো দশটি দিনে' সোভিয়েত বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল ইতিহাসের বিপুলতম পরিবর্তন। প্রথম প্রলেতারীয় রাষ্ট্র নিজেকে বজায় রেখেছিল ও সংহত করে তুলেছিল অতি প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, হয়ে উঠেছিল শক্তিধর বাহিনী, সর্বত্র মুক্তি-শক্তির পরীক্ষিত ও দৃঢ়ীভূত অগ্রবাহিনী। সেই ১৯১৮ সালেই ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কিত মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে আতঙ্ক গোপন করার চেষ্টা হয়েছে শীতল হিসাবী ভাষার মধ্যে ঃ "ভারতে রুশ বিপ্লবকে মনে করা হয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয়…রুশ বিপ্লব ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুপ্রাণিত করেছে।" সাম্রাজ্যবাদীরা যেখানে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গালিগালাজপূর্ণ প্রচার চালিয়েছিল এবং নির্মমভাবে দমন করেছিল সমাজতান্ত্রিক-আন্দোলন-ধরনের সমস্ত কিছু, ভারত কিন্তু তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভব করেছিল লেনিন ও বলশেভিকদের আরব্ধ বিরাট পরীক্ষাকার্যের সঙ্গে আত্মীয়তা। ১৯১৯ সালে, এমনকি গান্ধীও— যিনি কখনোই ধারেকাছে সমাজতন্ত্রী ছিলেন না—গণ-সংগ্রাম তুলে নিতে অস্বীকার করেছিলেন, তৎকালীন ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড রুশী আক্রমণের আশঙ্কার কথা তোলা সত্ত্বেও। গান্ধী তীক্ষ্ণভাষায় প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, "বলশেভিকরা বিপদের কারণ হতে পারে একথায় আমি কখনো বিশ্বাস করিনি।" তার কারণ, মূলগতভাবে তিনি চালিত হতেন, যাকে বলা চলে, স্বাধীনতার জন্য ভারতের সংগ্রামের ঐতি-

হাসিক অনুজ্ঞা থেকে। আরো বলা চলে, এটা কোনো কার্যকারণহীন বিবৃতি নয়, বরং সময়েরই লক্ষণ যে বিশেষ করে নভেম্বর বিপ্লবের কল্যাণে বিশ্ব-রাজনীতিতে নতুন এক সাহসী বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল এবং অনুশীলনসিদ্ধ নম্রতা সত্ত্বেও কণ্ঠে বজ্র নিয়ে গান্ধী লিখেছিলেন, "শয়তানতুল্য (ব্রিটিশ) গভর্নমেণ্টকে শোধরানো যাবে না, কিন্তু শেষ করতেই হবে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, এপ্রিল ১৯১৯)

যে তিলককে সাম্রাজ্যবাদী লেখক স্যার ভ্যালেনটিন চিরল আখ্যাত করেছিলেন "ভারতীয় অশান্তির জনক" হিসেবে সেই তিলক তাঁর পত্রিকা 'কেশরী'তে প্রকাশ করেছিলেন (২৯ জানুয়ারি ১৯১৮) লেনিন সম্পর্কিত একটি লেখা, যাতে জোর দিয়েছিলেন "কার্ল মার্কসের সমাজ-তান্ত্রিক তত্ত্বের" প্রতি লেনিনের আনুগত্যের ওপরে, "শান্তির" প্রতি তাঁর সমর্থনের ওপরে, শ্রমজীবী জনগণের সৃজনশীল ভূমিকায় তাঁর গুরুত্ব আরোপের ওপরে, তাঁর কৃষি-বিষয়ক অনুশীলনের ওপরে ("অসাধারণ কৃতিত্বমণ্ডিত")। এ-ঘটনা প্রকৃতপক্ষেই চমকপ্রদ, যদি স্মরণ রাখা যায় যে তৎকালে নবজাত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কী প্রচণ্ড প্রচার-অভিযানই না চলেছিল। মাদ্রাজের একটি সভায় (২৩ ডিসেম্বর ১৯১৯) তিলক এই মতপ্রকাশ করেছিলেন যে "সময়ের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের সংগঠনের কর্তৃত্ব বেড়ে চলবে এবং শ্রমিকরাই হয়ে উঠবে শাসক।" ২১ জানুয়ারি ১৯১৯ তারিখে বোম্বাইয়ের মহান ধর্মঘট' সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য করতে গিয়ে 'কেশরী' পত্রিকায় বলা হয়েছিল, "ধর্মঘটের কারণ নতুন সময়ের সৃষ্ট সচেতনতা।" তৎপূর্বে অপর একটি প্রখ্যাত পত্রিকা বোম্বে ক্রনিক্‌ল'-এ লেনিন ও তাঁর লক্ষ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে (১১ জানুয়ারি ১৯১৮) মন্তব্য করা হয় যে লেনিন যদি সফল হন তাহলে তা হবে "সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত জয়লাভ"। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৯১৯), "বলশেভিকরা প্রয়াস করছে রাশিয়াকে আরো শ্রেয় ও আরো মহৎ করে তুলতে—রাশিয়া ইতিপূর্বে

যা কখনো হতে পারেনি (দ্রষ্টব্য, এস জি সরদেশাই, 'ভারত ও রুশ বিপ্লব', নয়াদিল্লী, ১৯৬৭ পৃঃ ২৩-২৮)।

যদিও সোভিয়েত দেশের সংবাদ ভারত থেকে শক্ত হাতে আড়াল করা হয়েছিল—ইউরোপকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য বেষ্টনী থেকেও অনেক বেশি কঠোরভাবে, তবুও ভারতের নেতাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল শান্তি ও জমি সম্পর্কিত লেনিনের বিখ্যাত ডিক্রী, রাশিয়ার জনগণের অধিকার সম্পর্কিত তাঁর ঘোষণা, রাশিয়ার ও প্রাচ্যের মুসলমান শ্রমজীবীদের প্রতি আবেদন। ভারতীয় নেতারা এগুলিকে খুবই মূল্যবান মনে করতেন (দ্রষ্টব্য : দেবেন্দ্র কৌশিক ও লিওনিদ মিত্রোখিন সম্পাদিত 'লেনিন—ভারতে তাঁর ভাবমূর্তি' দিল্লী ১৯৭০, পৃঃ IX-X)। সেই ১৯১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখেই ভারতের বড়লাট হোয়াইট্‌হল থেকে এই মর্মে একটি তারবার্তা পেয়েছিলেন যে সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট বেতার মারফৎ "রাশিয়ার ও প্রাচ্যের সকল শ্রমজীবী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে" যে "প্রচণ্ডরকমের উত্তেজনাপূর্ণ ঘোষণা" প্রচার করেছে তাকে অবশ্যই "যতো বেশিদিন সম্ভব চেপে রাখতে হবে।" মুসলমানদের আনুগত্য যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সচিত লণ্ডনে আগা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে দেখা করার জন্য বড়লাটকে নির্দেশ পাঠান। সকল জাতির স্বাধীনতা সম্পর্কিত লেনিনের ঘোষণাকে ব্রিটিশ কৃত্যকারীরা বলেছিল "পৈশাচিক"। সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েতকে যতোই অভিশাপ দিক না কেন, কিন্তু কোনো কিছুতেই সোভিয়েত সম্পর্কিত কিছু কিছু খবর ভারতে আসা আটকানো গেল না। খবরগুলি ছিল এই ধরনের—বিপ্লবের পরে চমৎকার এক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে সোভিয়েত বর্জন করেছে সকল "অগ্রাধিকার", "বশ্যতা-স্বীকার," "সুবিধা" ও "বিশেষ অধিকার"—যেগুলি জারতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট, তৎসহ অন্যান্য বৃহৎ শক্তি, এশিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রে ভোগ করে আসছিল ; সোভিয়েত মহান ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব গড়ে তুলছে সান-ইয়াৎ-সেনের চীনের

সঙ্গে, কামালের তুরস্কের সঙ্গে, ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে; যেখানে ইউরোপীয় শক্তিগুলি তাদের সাম্রাজ্য ও শোষণের নোংরা থাবা বাড়িয়ে চলে সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীতক্রমে সোভিয়েত শাসন এ-বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছে যে প্রধান জনগোষ্ঠী রুশরা যেন তাদের উৎকর্ষকে ব্যবহার করতে পারে পশ্চাদপদ ও আগেকার কালে পদদলিত জনগোষ্ঠীসমূহের শিক্ষাদানে—এমন এক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রয়াসে যাতে এই জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের মতো দক্ষতা অর্জন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবমণ্ডিত জাতীয় নীতি সম্পর্কে কিছু কিছু খবর জানতেও ভারতের খুব বেশি দেরি হল না। ত্রিশের দশক থেকে অল্পস্বল্প যেটুকু খবর এসে পৌঁছত তা থেকেই ভারত বুঝতে পেরেছিল কি-ভাবে যাযাবররা হয়ে উঠেছে ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক কৃষক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, কি-ভাবে আগেকার কালের অন্তরালবর্তী নারীরা মুক্তি পেয়েছে স্বাধীনতার দীপ্তিতে, কি-ভাবে যুগের পর যুগ সুপ্ত হয়ে থাকা জনগণের সৃজনশীল প্রাণশক্তি লাভ করেছে মহৎ আবেগ।

১৯২১ সালে বিহারের উদারপন্থী নেতা সচ্চিদানন্দ সিংহ তার 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রিকায় আমেরিকান লেখক আপ্‌টন সিনক্লেয়ার-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন কি-ভাবে সাম্রাজ্যবাদের একেবারে গোড়া নড়িয়ে দিয়েছে সোভিয়েত এবং ঠিক এই কারণেই বিশ্ব-পুঁজিবাদের দ্বারা একযোগে অত্যন্ত নির্মমভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। এর চেয়েও আরো বেশি আগ্রহোদ্দীক বিষয় হচ্ছে বিপিনচন্দ্র পালের কথা। বিপিনচন্দ্র পাল এক সময়ে খ্যাত ছিলেন ১৯০২-০৭ সালের চরমপন্থী ত্রয়ী "লাল-বাল-পাল" (লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল)-এর অন্যতম হিসেবে। তিনি ১৯১৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলেছিলেন, প্রলেতারিয়েতের উত্থান হয়েছে, যে প্রলেতারিয়েত নির্বিত্তদের অপরাজেয় চ্যালেঞ্জ, যে চ্যালেঞ্জের সামনে ধনীদের ও তথাকথিত "উচ্চতর" শ্রেণীর শক্তি চূর্ণ হয়ে যাবে—যেমন দেখা যাচ্ছে ইতিহাসে বলশেভিকদের ভূমিকায়। (দ্রষ্টব্য: গৌতম

চট্টোপাধ্যায়, 'লেনিন ও সমকালীন বাংলা', কলকাতা ১৯৭০, পৃঃ ১৭)

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়েছে, ১৯২২ সালে মস্কোয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য পাঁচজন ভারতীয়কে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যদিও তৎকালে এই আমন্ত্রণের কথা তাঁরা জানতে পারেননি (কারণ ব্রিটিশ পুলিস আমন্ত্রণ-পত্র আটক করেছিল)। এই পাঁচজন ভারতীয় হচ্ছেন এম এন রায়, এস এ ডাঙ্গে, নলিনী গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও চিররঞ্জন দাস। সুভাষচন্দ্র—পরবর্তী কালে দেশবাসীরা যাঁর নামে 'নেতাজী' বলে জয়ধ্বনি দিয়েছে—তখন ছিলেন তরুণ ও দীপ্ত দেশপ্রেমিক, তখনও পর্যন্ত নিজস্ব সামাজিক দর্শনে অব্যবস্থিত, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে অসাধারণ কর্মী। চিররঞ্জন দাস ছিলেন দেশবাসীর কাছে 'দেশবন্ধু' নামে খ্যাত এবং একমাত্র গান্ধীর পরে অদ্বিতীয় দেশনেতা চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র। বিশ্ব-কমিউনিজমে একসময়ে সুপরিচিত এম এন রায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত নলিনী গুপ্ত পূর্বে ছিলেন সন্ত্রাসবাদী, বিদেশে গিয়ে কমিউনিজম গ্রহণ করেন। ডাঙ্গে—পঁচাত্তর-বছর বয়সেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে এখনো যিনি অক্ষুণ্ণশক্তি—১৯২১ সালে নিজের থেকেই 'গান্ধী বনাম লেনিন' নামে একটি ছোটবই লিখেছিলেন এবং ১৯২২ সালে বোম্বাইয়ে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন সাপ্তাহিক 'দ্য সোশ্যালিস্ট'।

এপ্রিলের ৬ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রতিবছর ভারতে উদ্‌যাপিত হয় আমাদের জাতীয় সপ্তাহ। এই দিনগুলিতে মনে পড়ে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে কী ঘটেছিল ; মনে পড়ে নিরস্ত্র ভারতীয়দের হত্যাকাণ্ড, বিশেষ করে অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগে। প্রকৃতপক্ষে এই পাঞ্জাবেই, ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে, যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম গণ-অভ্যুত্থান হয়ে উঠেছিল ভারতের অন্য যে-কোনো জায়গার চেয়ে ব্যাপকতায় ও গভীরতায় উচ্চতর। অপ্রত্যাশিত একটি উৎস থেকে তার কারণ জানা যাচ্ছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে (১৯১৯) এই মন্তব্য পাওয়া যায় : "যুদ্ধ শেষ হবার পরে ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের

বিভিন্ন ফ্রণ্ট থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের মুখে গ্রামের লোকেরা শুনতে পায় দূরের দেশ রাশিয়ার ঘটনাবলী। উত্তর ভারতের বহু গ্রাম সম্পর্কে একথা সত্য, বিশেষ করে সত্য পাঞ্জাবের গ্রাম সম্পর্কে—কেননা ভারতীয় সৈন্যদলের অধিকাংশকে এই পাঞ্জাব থেকেই ভর্তি করা হয়েছিল। এবং এই সৈন্যরা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং তুর্কিস্তান ও ট্রান্সকাস্পিয়া ও মধ্য-এশিয়ার সৈন্য-চলাচলে জড়িত ছিল।" তাছাড়া, আমেরিকায় বসবাসকারী পাঞ্জাবী দেশত্যাগীরা গঠন করেছিলেন 'গদর' পার্টি এবং এই পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন হরদয়ালের মতো ব্যক্তিরা। যিনি সেই ১৯৩৮ সালেই 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় "আধুনিক ঋষি" কার্ল মার্কস সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং স্বদেশের কৃষকদের সঙ্গে ও সৈনিকদের সঙ্গেও ব্যাপক সংস্পর্শ রাখতেন। কাজেই এটা অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার নয় যে ভারতের যে-এলাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকটতম, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম এলাকা, এবং বিশেষ করে পাঞ্জাব, সেখানেই ১৯১৯-২২ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘটে। ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করেছিল এবং তা করতে গিয়ে কমিউনিজমকে অভিযুক্ত করে পেশোয়ার ও লাহোরের বিচারে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করেছিল। এই সমস্ত মামলা ইতিহাস হয়ে উঠেছে। তুর্ভাগ্যের বিষয়, জনগণের নেতৃত্ব এমন ছিল না যে, সময় যে-সব কর্তব্য ঠেলে তুলেছে তার মোকাবিলা করতে পারে। পরবর্তী কাল ছিল অনালোড়নের। তবুও তারই মধ্যে, জরুরি কথা এই যে আমাদের একজন মহান ভারতীয় বীর, ভারতের বিপ্লবী তরুণদের আদর্শ, ভগৎ সিং ১৯৩১ সালে ফাঁশিকাঠে উঠেছিলেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক) ধ্বনি তুলতে তুলতে এবং ফাঁশির আগের দিন রাতে গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করেছিলেন লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'। এই ঘটনায়, বলা চলে, নির্মম এক পরিপূর্ণতা লাভ করছে একজন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীর আতঙ্কপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী, তার নাম টমসন, অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য নিষ্ঠুর অত্যাচারের কৃতকর্ম থেকে

ব্রিটিশদের দোষক্ষালন করার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানরত হাণ্টার কমিশনের (১৯১৯) সামনে সে সাক্ষ্য দিয়েছিল। এল মিত্রোখিন ও এ রাইকভ সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত যে সব গোপন দলিল উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায়, কর্মচারীটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আমার মনে হয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্বে (তলস্তয়ের ধারণা অনুসরণ করে গান্ধীর দ্বারা প্রচারিত) যে জমি পরিপূর্ণরূপে সিক্ত তা বলশেভিক ধ্যানধারণার বাড়বৃদ্ধির পক্ষে খুবই ফলপ্রসূ—নয় কি ?" টমসনের গুরুগম্ভীর জবাব : "আমি তাই মনে করি, হুজুর। যাই হোক না কেন, উভয় তত্ত্বেই আইন ও বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে অমান্য করা উৎসাহিত হয়।"

গৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর উল্লিখিত বাঙলা লেখায় ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা অফিসার সিসিল কেই-র গোপন রিপোর্টের (১৯২১) প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংযুক্ত প্রদেশ (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) ও বাঙলায় যে-সব ক্ষেতমজুর সংগঠন গড়ে উঠছে সেগুলো "বলশেভিক"-মনোভাবাপন্ন এবং ভারতীয় কৃষকদের কাছে বলশেভিক-ধাঁচের জমিবণ্টন-ব্যবস্থা অতিশয় অভিনন্দিত হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের ভয় বাস্তবিকই অতি প্রবল ছিল, এই কারণেই শুরু করা হয়েছিল নির্মম অত্যাচার। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (বোম্বাই ১৯২০) সভাপতি লাজপৎ রায় এই বলশেভিক-বিরোধী কুৎসার উল্লেখ করে বলেন যে রাশিয়া সম্পর্কে "পুঁজিবাদী ও সরকারি সত্য গলাধঃকরণ" করতে তিনি রাজী নন। আরো বলেন, "পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সত্যের চেয়ে বলশেভিক সত্য যে-কোনো সময়েই আরো উত্তম, আরো নির্ভরযোগ্য ও আরো মানবিক।"

* * *

এমনিভাবে, বিপুলাকার ও হীন সাম্রাজ্যবাদী প্রচার সত্ত্বেও ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামী শক্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বহুলাংশে সহানুভূতিশীল ছিল, অনেকটা যেন সহজাত অনুভূতি থেকে—যদিও

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ তারা যাতে না পায় সেজন্য ছিল কঠোর ব্যবস্থা। তাদের মধ্যে যারা ছিল অধিকতর সচেতন—প্রধানত যাদের প্রতিভূ ছিল ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন এবং নির্মমভাবে নিপীড়িত কিন্তু সাহসের সঙ্গে উত্থিত কমিউনিস্টরা—তারা সকলেই নতুন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব থেকে প্রেরণা পেয়েছিল। যেমন ভারতে, তেমনি অন্যত্র, এই ধারণা ক্রমেই বাড়ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকছে হিংস্ররকমের বিরূপ একটি জগতে—যেখানে আছে, যে-সব ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার মধ্যে, গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক অবরোধ, দুর্ভিক্ষ ও চোদ্দ-চোদ্দটি পুঁজিবাদী দেশের দ্বারা চালিত হস্তক্ষেপমূলক যুদ্ধ। তার ফলে, সম্পূর্ণ দূর হয়েছে এই ধারণা যে সমাজতন্ত্র কল্পনার স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয় এবং স্বর্গের স্বর্ণ-তোরণের ইহপার্শ্বে তা কখনো বাস্তব হবার নয়। সমরখন্দ ও বুখারায় যদি সমাজতন্ত্র আসতে পারে তাহলে কেন আসতে পারবে না ভারতের অনুরূপ ঐতিহাসিক কেন্দ্র কাশী ও কাঞ্চীতে? ধ্যানধারণা যখন জনসাধারণকে ভর করে তখন তা হয়ে ওঠে বাস্তব শক্তি, তখন তা ডানা মেলতে পারে এবং কোনো বাধা গ্রাহ্য করে না। তেমনি সোভিয়েতের ধ্যানধারণা, যতোই শঠতার সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও আক্রমণ চলুক, তা যেন—বলা যেতে পারে—তার ঐতিহাসিক পাঁচসালা পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিস্ময়কর কৃতিত্বের বার্তা নিয়ে দুনিয়া সফরে বেরিয়ে পড়েছে। ভারত তার ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির পিছুটান সত্ত্বেও বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রবহমান নতুন বাতাস সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারেনি।

তারপরের ঘটনা এই যে ইউরোপে ও আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতের দেশত্যাগী বিপ্লবীরা মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে ; এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী, অনেকটা যেন মধুর উৎসে মৌমাছির গমনের মতো, বিশ্বের নতুন বিপ্লবের রাজধানীর দিকে ধাবিত হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লা, ওবেইদুল্লা সিন্ধি ও

আরো অনেক চিত্তাকর্ষক ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব—যথা, এম এন রায়, যিনি মেক্সিকো থেকে মস্কো পৌঁছেছিলেন ১৯২০ সালে; হরদয়ালের নেতৃত্বে গদর পার্টির প্রতিনিধিরা ও আরো অনেকে; বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবী কমিটির নেতারূপে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যরা, যাঁদের সম্পর্কে সোভিয়েত ও ভারতীয় পণ্ডিতরা প্রচুর গবেষণা করছেন। এম এন রায় বাদে তাঁরা কেউ রাশিয়ায় পেঁছবার আগে কমিউনিস্ট ছিলেন না, ছিলেন শুধু ভারতের স্বাধীনতা-অভিলাষী একাগ্র জাতীয়তাবাদী। এই দেশত্যাগীদের মধ্যে কেউ কেউ তাসখন্দে (১৯২৪) একটি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন ভারতের মাটিতেই জন্ম নিচ্ছিল ১৯২০ সাল থেকে এবং পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছিল ১৯২৫ সালে। তার আগে কমিউনিস্টরা চেষ্টা করেছিল স্বতঃস্ফূর্ত গণ "মিছিল ও উদ্দাম উৎসাহের" ওপর নির্ভর না করে বরং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে (আমেদাবাদ, ডিসেম্বর ১৯২১) শ্রমিক ও কৃষকের উদ্দেশ্যের সহায়ক করে তুলতে, এবং পরবর্তী অধিবেশনে (গয়া, ডিসেম্বর ১৯২২) উপস্থিত করেছিল প্রতিনিধিদের কাছে আবেদনের আকারে একটি কর্মসূচী।

মহান লেনিন তাঁর বিপুল কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন—বিশেষ করে ভারতের প্রশ্নে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (জুলাই-অগস্ট ১৯২০) এম এন রায়ের গোঁড়ামিপূর্ণ ভ্রান্তিকে সংশোধন করার জন্য এবং মৌল নির্দেশ-পথ সূত্রবদ্ধ করার জন্য তিনি যে কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ দেবার প্রয়োজন এই পুস্তিকায় নেই। আক্ষেপের বিষয়, আমাদের আন্দোলন এই নির্দেশ-পথ বিশ্বস্তভাবে কার্যকর করতে অসমর্থ হয়েছে। ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি দলের অভিনন্দনের জবাবে লেনিন যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন (২০ মে ১৯২০), এ-প্রসঙ্গে তা স্মরণ করাটাই যথেষ্ট: "...রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ অব্যাহত মনোযোগ নিয়ে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকের জাগরণ লক্ষ করছে।...মুসলমান ও

অ-মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আন্তরিকভাবে চাই এই মৈত্রী প্রাচ্যের সকল শ্রমজীবীর মধ্যে সম্প্রসারিত হোক। কেননা, একমাত্র যখন ভারতীয়, চীনা, কোরীয়, জাপানী, পারসিক, তুর্কী শ্রমিক ও কৃষকরা হাত মেলাবে এবং মুক্তিলাভের সাধারণ উদ্দেশ্য-সাধনে একসঙ্গে অভিযান করবে—একমাত্র তখনই নিশ্চিত হবে শোষকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ। মুক্ত এশিয়া দীর্ঘজীবী হোক!" (সরদেশাই-এর পূর্বোক্ত পুস্তকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৫৬)

কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'শঙ্খ' পত্রিকায় লেনিনের একটি জীবনী দু-বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, লিখেছিলেন প্রখ্যাত জাতীয় বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। ১৯২৩ সালে বাংলা 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় লেনিনের জীবনী বিষয়ক একটি লেখা ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন অমূল্যচরণ অধিকারী। আরো একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে ফণীভূষণ ঘোষের লেখা লেনিনের সংক্ষিপ্ত বাংলা জীবনী (কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯২১), যে রচনার প্রধান নির্ভর ছিল পূর্বে উল্লিখিত এস এ ডাঙ্গের 'গান্ধী বনাম লেনিন'। তৎকালীন বাংলার জাতীয় বিপ্লবীদের বিখ্যাত মুখপত্র 'বিজলি' পত্রিকায় ১৯২১ সাল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল—যেমন হয়েছিল তার সহযোগী 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়—রুশ বিপ্লবের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত ও বিশেষ করে লেনিন সম্পর্কিত প্রবন্ধ। ১৯২৩ সালে অগ্রণী জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক অতুল সেন ঢাকা থেকে 'রাশিয়ার রূপান্তর' নামে একটি বাংলা পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২২ সালে সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল—নতুন রাশিয়া সম্পর্কে এবং সমগ্র প্রাচ্যের স্বাধীনতা সম্পর্কে জোরালো সব প্রবন্ধ। এই পত্রিকায় বাংলার মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রায়ই লিখতেন। ১৯২৩ সালে প্রিয়কুমার গোস্বামী ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছিলেন 'স্বাধীনতার প্রকৃত চরিত্র' নামে বাংলায় একটি আলোচনামূলক পুস্তক, যাতে তিনি, তখনো পর্যন্ত যতোখানি জানা যেতে পারত তার ভিত্তিতে, সোভিয়েত

অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলেন। একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল আরো কতকগুলো পুস্তক—যথা, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লেনিন ও সোভিয়েত', হেমন্তকুমার সরকারের 'স্বরাজ কোন পথে ?', নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রুশ জনগণের বীর', শৈলেশনাথ বিশীর 'বলশেভিকবাদ'। সবকটি পুস্তকই বাংলায়, ভিত্তি ছিল তখনো পর্যন্ত লভ্য অনিবার্যরূপেই অ-পর্যাপ্ত তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মৌল অবলম্বন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল জাতীয়তাবাদ। মর্যাদাশীল ইংরাজী মাসিক 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল মহান কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রবন্ধ—'কমনওয়েল্থ সম্পর্কে লেনিন বনাম রাষ্ট্র'। কয়েক বছর পরে এই একই লেখকের হাত থেকে বেরিয়েছিল সোভিয়েত সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে (বাংলায়) গোড়ার দিককার বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার একটি বই—'বিশ্ব-মানবের লক্ষ্মীলাভ'। বাংলা লেখায় মার্কসবাদের একজন পথিকৃৎ রেবতী বর্মন ১৯২৫ সালে প্রকাশ করেছিলেন 'নবীন রাশিয়া' সম্পর্কে একটি বই। অব্যবহিত পরে সরোজ আচার্য একই পথের পথিক হয়েছিলেন 'নূতন রাশিয়া' নামে বই লিখে। আসে ১৯২৮ সাল, ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়ে যায়, আর তখন বাংলা 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হতে পারে: "চৌরঙ্গীর প্রাসাদ হইতে 'স্টেট্সম্যান' (বুর্জোয়া স্বার্থের মুখপত্র) যথা অভিরুচি মস্কোর বিরুদ্ধে লড়াই চালাক। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, একটি দেশে কমিউনিজমের উদ্ভব ঘটাইবার পরেও পুঁজিবাদীদের চৈতন্য হয় নাই। তাহাদের ধরনধারন এতই নির্বোধ যে দেশের পর দেশে, ভূ-গোলকের অঞ্চলের পর অঞ্চলে তাঁহারা কমিউনিজমকে অস্তিত্বশীল করিয়া তুলিবে।" (পুনরনূদিত, ১ জুন ১৯২৮, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বে উল্লিখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

মস্কোতে লেনিনের সমাধিতে সংখ্যাতীত শোকার্ত মানুষের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একজন বাঙালী, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি

কাবুলে শিক্ষকতা করতেন, ১৯২২ সালে ওবেইদুল্লার প্রভাবে শিক্ষকতা ত্যাগ করেন এবং একদল অকুতোভয় ভারতীয় সহ সীমান্ত পার হয়ে লেনিনের দেশে উপস্থিত হন। সুখের বিষয়, তিনি এখনো জীবিত আছেন, বহু বছর ধরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন এবং 'মডার্ন রিভিউ' (১৯৭২-৭৩) পত্রিকায় সোভিয়েতে অবস্থানের স্মৃতিকথা লিখেছেন। গৌতম চট্টোপাধ্যায় আরো অনেকের সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন—যথা, অবনী মুখোপাধ্যায়, যিনি সিঙ্গাপুরে জেল ভেঙে পালিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে মস্কোয় হাজির হন (জুন ১৯২০); গোপেন চক্রবর্তী, যাঁকে লেনিনের দেশে পাঠিয়েছিল বাঙলার সন্ত্রাসবাদীরা, যিনি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন (১৯২৩) এবং সমুদ্রপথে ও ইউরোপে আত্মগোপনের স্থানগুলোতে কমরেডদের সাহায্য পেয়েছিলেন, এবং এমনিভাবে চলতে চলতে বহু মাস পরে লেনিনগ্রাদে পা দিতে পেরেছিলেন। আরো প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। মনে রাখার মতো কথা এই যে ভারত তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকে এক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল—সোভিয়েতে প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য অনুসন্ধান। আর সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাণপণে এই অনুসন্ধানকে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। এই লেখায় অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে বাঙালীদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপরে। তার কারণ এই যে বর্তমান লেখক নিজেও বাঙালী এবং তার নিজের অঞ্চলের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তবে একথাও স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে এই অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িত ছিল সারা ভারত। ছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, যেটি ভৌগোলিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকটতম। তাছাড়াও ছিল জীবন ও কর্মের মহান কেন্দ্র বোম্বাই ও মাদ্রাজ—সোভিয়েতে প্রতিফলিত নতুন ঐতিহাসিক ব্যাপারের দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত। হিমালয়ের ওপারে যে নতুন সৃষ্টিশীল আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রতি ভারতীয় লেখকরা ও চিন্তাবিদরা সর্বত্র নির্বিকার

থাকতে পারেননি। কুড়ির দশকের শেষদিকে ভারতীয় ভাষার সংস্করণে লভ্য গোর্কির 'মা' হয়ে উঠেছিল অনেকটা যেন এক বৈপ্লবিক অনুঘটক। লেনিনের জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল হিন্দী, তেলেগু, মালয়ালম, মারাঠী ও অন্যান্য ভাষায়। লেনিনের জীবনী সম্পর্কে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের জীবনী সম্ভবত লিখেছেন দক্ষিণ ভারতীয় লেখক জি ভি কৃষ্ণরাও (১৯২১)। তার চেয়েও জরুরি কথা, শ্রমিক আন্দোলনের (সেই সঙ্গে আরো খানিকটা কাটা কাটা ভাবে কৃষক আন্দোলনের) অগ্রগতির ফলে স্বাধীনতার সংগ্রামে ও সোভিয়েত জীবন সম্পর্কে নীতিনিষ্ঠ আগ্রহে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর তৎকালীন এক শীর্ষস্থানীয় মুখপাত্র, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, লেনিনের মৃত্যুতে পূর্ণ এক সপ্তাহব্যাপী শোক-পালনের ডাক দিয়েছিলেন। কোনো কিছুই—না ভারতের তিমিরাচ্ছন্নতার পরিপোষকতা, না সাম্রাজ্যবাদের ধূর্ততা—ভারতের কাছে প্রচ্ছন্ন করতে পারেনি সেই গৌরব যার নাম লেনিন, মনুষ্যজাতির কাছে লেনিনের সেই উত্তরাধিকার যার নাম সোভিয়েত ইউনিয়ন।

চার

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ক সমিতির—'ভোকস' (Voks) প্রচারিত সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিন, চল্লিশের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্তও কী উৎসাহভরে আমরা গ্রহণ করতাম আমাদের কারও কারও তা মনে আছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে 'ভোকস' গঠিত হয়েছিল, ভারতের মতো দীর্ঘকাল কষ্টভোগী ও পরাধীন দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উপরে সম্ভবত বিশেষ জোর দেওয়া হত। ভোকস চিঠিপত্র আদানপ্রদান করত বহু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এবং বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির সঙ্গেও, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন মালব্য ও আর জি পরঞ্জপে। বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী সি ভি রামন ১৯২৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (রামন এখানে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক ছিলেন) ও ১৯৩২ সালে ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাঙ্গালোর ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্সের পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতশাস্ত্রজ্ঞদের সঙ্গে সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতশাস্ত্রজ্ঞদের যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ক্যালকাটা ম্যাথ্‌মেটিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় ও উক্রাইন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি সহ বিভিন্ন সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রামন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হন, বহুবার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। ১৯২৬ সালে জনৈক তরুণ ভারতীয় গবেষক এ কে সাহা (পরবর্তী কালে ইনি

ভারতের প্রাক্‌-স্বাধীনতা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কাজে সাহায্য করেন) মস্কোর ইনস্টিটুট্যট অব বায়োলজিক্যাল ফিজিক্স-এ অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯২৮ সালের মধ্যে, ৩০টির বেশি সোভিয়েত এবং ১৮টি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ইনস্টিটুট্যট, বিদ্বজ্জনসংস্থা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকে। সোভিয়েত বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে বুর্জোয়া দুনিয়ায় জঘন্য কুৎসার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয় 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা (জুন ১৯২৭)—পত্রিকাটি লিখেছিল, সেটা এমন "উন্নতি" যা 'শিক্ষিত পাশ্চাত্য দেশ' স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনা।" স্বাধীনতা আন্দোলনের বামপন্থী অংশ এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ভ্রমণের (নভেম্বর ১৯২৭) পর জওয়াহরলাল নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিগত যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যের উপরে, রুশ-ভাষা অধ্যয়ন এবং বুদ্ধিগতভাবে পুরোপুরি ব্রিটিশ সূত্রের উপরে নির্ভর-শীলতা দূর করার গুরুত্বের উপরে জোর দেন।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী ভি ভি মারকোভিচের ভারত সফর (১৯২৭-২৮) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। তাঁর সফরের ফলস্বরূপ বিভিন্ন ভারতায় গাছ গাছড়ার বীজ ও শিকড় তিনি সংগ্রহ করেন (এগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সুখুমির বোটানিক্যাল গার্ডেনে সযত্নে লালিত হয়)। এগুলি পরীক্ষা করে অ্যাকাডেমিশিয়ান এন আই ভাভিলভ নিঃসংশয় হন যে ভারত ছিল এশিয়ায় 'তৈরী-করা' গাছগাছড়ার উদ্ভবের প্রধান কেন্দ্র ; তাঁর মনে ভারত ভ্রমণের তীব্র ইচ্ছা জাগে, কিন্তু তৎ-কালীন অবস্থায় তা সম্ভব হয়নি। বিশের দশকের শেষ দিকে সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলের সুদূরপ্রসারী সামাজিক পুনর্গঠন ও প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ বিশ্বব্যাপী কৌতূহল সৃষ্টি করে—মাঝে মাঝে শুল্ক বিভাগের বেড়া ডিঙিয়ে দু-চার কপি "ইউ এস এস আর ইন কন্‌স্ট্রাকশান" এসে পৌঁছয়—কয়েক-জন ভারতীয় বিজ্ঞানী মধ্য এশিয়ায় সেচব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সোভিয়েত পুস্তক-পুস্তিকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন বলেও জানা যায়। ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্লেগ-বিরোধী সম্মেলনে (১৯২৮)

অধ্যাপক নিকিফরভের আগমনের ফলে পাঞ্জাবের ম্যালেরিয়া সার্ভিস এবং মস্কো ও বাকুর ট্রপিক্যাল ইন্সিট্যুটের মধ্যে নিয়মিত প্রকাশনা-বিনিময় ঘটতে থাকে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বেশ কয়েক-জন ভারতীয় বিজ্ঞানী সোভিয়েত ইউনিয়নে যান এবং ত্রিশের দশকে জীব-রসায়নের ক্ষেত্রে ভি আই ভেরনাদস্কির গুরুত্বপূর্ণ কাজ (ব্রিটিশ পত্রিকা 'নেচার'-এ প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে) ভারতে সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভের ফলে মস্কো ও লেনিনগ্রাদের বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতার বিজ্ঞান সংস্থাগুলির ফলপ্রসূ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। নির্মাণযজ্ঞে তাঁদের কাজের অপরিসীম গুরুত্বের দরুন সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞানীরা কিভাবে সমাদৃত ও সম্মানিত হয়ে থাকেন তা দেখে আমাদের বিজ্ঞানীরা আনন্দিত হন। তুটি পাঁচসালা পরি-কল্পনা সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সোভিয়েত বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতের আগ্রহ বিরাট ভাবে বেড়ে ওঠে। আমাদের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী লখনৌয়ের বি সাহানি 'ভোকস' এর কাছে ভূতত্ব ও প্রত্নজীবতত্ত্বের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের অধুনাতম কাজের খবরাখবর জানতে চান, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স বিশেষ কৌতূহলজনক কতকগুলি প্রবন্ধের অনুবাদের জন্য অনুরোধ জানায়। ১৯২৮ সালে ১৮টির মতো ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি ও পত্রিকা সোভিয়েত বিজ্ঞান সমিতি ও পত্রিকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। সংখ্যাটা ১৯৩২ সালে বেড়ে হয় ৪১, ১৯৩৪ সালে ৪৯, এবং ১৮৩৭ সালে ৬৬; আর ১৯৪০ সালের মধ্যে ৪৭টি ভারতীয় গবেষণা সংস্থা অন্যান্য সংগঠন ছাড়াও সোভিয়েত ইউ-নিয়নের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সঙ্গে সরাসরি পত্রবিনিময় করতে থাকে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঔপনিবে-শিক সরকারের কাছে নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল, কিন্তু তা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : "সোভিয়েত ল্যাণ্ড" পত্রিকার মার্চ ১৯৭৪ এর ষষ্ঠ সংখ্যায় এ আই ইউনেলের প্রবন্ধ)।

ভারতে মুক্তি সংগ্রামের প্রথম প্রবল জোয়ারের (১৯১৯-২২)

পর একটা ভাঁটার কালপর্ব দেখা দেয়; জনগণের মনের আলোড়ন কখনোই প্রশমিত হয়নি; বিশের দশকের শেষ দিকে শুরু হয় এক নতুন জোয়ার, ১৯৩০-১৯৩২ সালে সংগ্রামের দ্বিতীয় প্রচণ্ড ঢেউয়ে তা ফেটে পড়ে। কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা ও সুচতুর কুৎসা সত্ত্বেও প্রগতি-শীল আন্দোলনকে, অন্তত আমাদের বুদ্ধিজীবিসমাজের একাংশকে সোভিয়েত যার প্রতিভূ মানবেতিহাসে সেই বিপুল পরিবর্তন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায়নি, আগেই সে কথা বলা হয়েছে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় চিন্তার গণ্ডির মধ্যে প্রচণ্ডভাবে আবির্ভূত হয়; কারণ ব্যক্তি হিসেবে অনন্য ও বিরাট সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষার ঐতিহাসিক মুখপাত্র অন্তত তিনজন প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয় সোভিয়েত দেশ দর্শন করে এক নতুন জীবন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত করেন। সোভিয়েত সম্পর্কে মার্কিন লেখক লিঙ্কন স্টিফেন্স-এর স্মরণীয় উক্তি (১৯২৫) এই প্রসঙ্গে মনে পড়েঃ আই হ্যাভ সীন দ ফিউচার অ্যাণ্ড ইট ওয়র্কস। প্রাচীন, গর্বিত, আহত এক দেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জওয়াহরলাল নেহরু ও ই ভি রামস্বামী নাইকার সোভিয়েত ইউনিয়নে যা দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, তার তাৎপর্য আরও বেশি।

নেহরু কখনোই মার্কসবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি, সেরকম দাবিও তিনি কখনো করেননি। কখনও কখনও তিনি সোভিয়েত জীবনের কোনো কোনো ব্যাপার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু প্রায় অনিবার্য-ভাবেই মেনে নিয়েছেন যে বিপ্লবী হিংসা আর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের দমনের কিছু ঐতিহাসিক যাথার্থ্য ছিল, কারণ এমনিতে 'নিন্দনীয়' হলেও 'সর্বনাশা ব্যর্থতাকে' তা রোধ করেছিল। মস্কোয় নভেম্বর বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসবে (১৯২৭) তাঁর পিতা মতিলাল নেহরুর সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেদেশে যান; 'সোভিয়েত রাশিয়া' (১৯২৮) গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লেখেন, ভারতে তা গভীর ভাবে রেখাপাত করে। সেই

সময়ে রেনে ফ্যুলোপ-ম্যুলার-এর "গান্ধী অ্যাণ্ড লেনিন" ও "দ মাইণ্ড অ্যাণ্ড ফেস অব বলশেভিজম"-এর মতো বইয়ের দুর্লভ দু-এক কপি অনেক চেষ্টার পর সংগ্রহ করা যেত ; এই বইগুলি কিছুটা অবৈজ্ঞানিক ও দ্ব্যর্থপূর্ণ রচনা হলেও, সোভিয়েত "এক্সপেরিমেণ্ট"-এর (সে সময়ে এই কথাটাই প্রায়শ ব্যবহৃত হত) ঐতিহাসিক গুরুত্বের ইঙ্গিত তাতে পাওয়া যেত। জওয়াহরলালের বইটি এল এক ঝলক তাজা হাওয়ার মতো, ভারতীয় মন থেকে তা অপসারিত করল বাহু উর্ণাজাল। তাঁর পিতা কোনোকালেই কমিউনিজমের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন না কিন্তু দেশে ফিরে আসার পর সোভিয়েতবিরোধী কুৎসা খণ্ডন করার মতো সততা তিনি দেখান, এবং শীর্ষস্থানীয় জাতীয় নেতা হিসেবে ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় 'স্বরাজ-পন্থী' গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে তাঁর পদমর্যাদা থেকে তিনি একথা ঘোষণা করতে ইতস্ততঃ করেননি যে সোভিয়েত মতাদর্শ তিনি বোঝেন না এবং মেনেও নেন না বটে তবে বহু জাতিবর্ণবিশিষ্ট এক জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির জন্য প্রচণ্ড কাজ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। কলকাতায় ছাত্রদের এক সভায় (১৯২৮) বক্তৃতা প্রসঙ্গে জওয়াহরলাল বলেন যে "আজ সে দাঁড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় বিরোধী হিসেবে, আর প্রাচ্যের জাতিগুলির সঙ্গে তার আচরণ ন্যায়সংগত ও উদার।" "সোভিয়েত রাশিয়া" গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন যে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করবে তখন "রাশিয়া আর ভারত বাস করবে শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে, বিরোধের বিষয় থাকবে স্বল্পতম।" সাম্রাজ্যবাদ যার জন্ম দিয়েছিল, যাকে লালিত ও পুষ্ট করেছিল সেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোভিয়েতের মহান ভূমিকা নেহরুর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৯২৯ সালে তিনি বলেছিলেন, "রাশিয়া যদি (দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার) সমাধান খুঁজে পায়, তাহলে ভারতে আমাদের কাজ সহজতর হয়ে যায়।" ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তিনি বলেন, "এক নতুন ব্যবস্থা ও নতুন সভ্যতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সেই মহান ও চিত্তাকর্ষক ঘটনাটি আমাদের

এই অন্ধকারময় যুগের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।" তিনি আরও বলেন, "ভবিষ্যত যদি আশাপূর্ণ হয়ে থাকে তবে তা অনেকখানিই সোভিয়েত রাশিয়ার দরুন, এবং যদি বিশ্বব্যাপী কোনো বিপর্যয় মাঝপথে বাধা না দেয় তাহলে এই নতুন সভ্যতা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়বে এবং পুঁজিবাদ যে যুদ্ধ আর বিরোধকে জীইয়ে রাখে তার অবসান ঘটাবে।" নেহরুর এমন কিছু ইতঃস্ততবিক্ষিপ্ত মন্তব্য বেছে বেছে বার করা কঠিন নয় যা সোভিয়েতবিরোধী হৃদয়ে পুলকসঞ্চার করতে পারে; কিন্তু তার মূল চিন্তা কোন সময়েই অস্পষ্ট ছিলনা। "ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া" (১৯৪৫) গ্রন্থের "লাইফ'স ফিলসফি" শীর্ষক অংশে রয়েছে বিখ্যাত সেই পংক্তি কটি: "সোভিয়েত বিপ্লব সমাজকে এক বিরাট লাফে এগিয়ে দিয়েছিল, জ্বালিয়েছিল এক উজ্জ্বল শিখা, যাকে নির্বাপিত করা যায়নি; এবং যে নতুন সভ্যতার দিকে পৃথিবী অগ্রসর হতে পারে তার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।" বস্তুতপক্ষে এই হল সেই মানুষটির বাণী যিনি সামাজিক শক্তিগুলি সম্পর্কে একটা উপলব্ধির দিকে পথ হাতড়ে অগ্রসর হতে হতে সমাজতন্ত্রকে মেনে নেওয়ার কথা ব্যক্ত করেছিলেন ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের এক দিকচিহ্ন স্বরূপ "হুইদার ইণ্ডিয়া ?" (১৯৩৩) রচনায় এবং লখনৌতে (১৯৩৬) বলেছিলেন: "আমি কাজ করি ভারতের স্বাধীনতার জন্য, কারণ আমার ভিতরকার জাতীয়তাবাদী সত্তা বিদেশী আধিপত্য বরদাস্ত করতে পারেনা। আমি তার জন্য কাজ করি আরও বেশী করে কারণ আমার কাছে তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিকে অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গান্ধী (এবং তাঁকে অনুসরণ করে নেহরু ও অন্যান্যরা) বলতেন গুরুদেব। কবি ও ভাবলোকবাসী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হয়তো গজদন্তমিনারে থাকার অধিকার ছিল, কিন্তু কখনও তিনি বেশিকাল তা থাকেননি; তাঁর দীর্ঘ, সৃষ্টিশীল জীবন জুড়ে তিনি নিজের মতো করে তাঁর দেশের জনগণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তাঁদের আশাআকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের সঙ্গে সত্যিই যুক্ত ছিলেন। সেই

বহুবিচিত্র-মনা কবির বিষয়ে আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা ভালো যে জনগণ থেকে কিছুটা দূরত্বে বসবাস করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কতকগুলি মূল ব্যাপার অনুভব করেছিলেন—১৯২৯ সালে তিনি যা লিখেছিলেন, তাঁর মতো একজনের পক্ষে সেরকম কথা লেখা কি বিস্ময়কর নয় ?—"ধনী নয়, গরীবদেরই প্রভূত সম্পদের দুর্বহ বোঝা থেকে সমাজকে উদ্ধার করতে হবে···দরিদ্রের দুর্বলতা এযাবৎ সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। ক্ষমতা অধিকার করে তাদের তার প্রতিকার করতে হবে" (দ্র. হীরেন মুখোপাধ্যায়, "হিমসেলফ-এ ট্রু পোয়েম : এ স্টাডি অব টেগোর," নয়াদিল্লি, ১৯৬১ পৃঃ ১২০ ; পুনরনূদিত)।

১৯৩০ সালে ইওরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণকালে তাঁকে হুঁসিয়ারি দেওয়া হয়েছিল—তিনি যেন সোভিয়েত ইউনিয়নে না যান ; কিন্তু তিনি অযাচিত পরামর্শে কর্ণপাত না-করে সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসেন। প্রথম দিককার একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, "আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।··· সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস।·· এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না, কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী"···পরে তিনি লিখেছেন, "এত বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার" কী করে ঘটল তার "উত্তর" তিনি পেয়েছেন : "লোভের বাধা কোনোখানে নেই।" অতিরিক্ত শাসন ও বলপ্রয়োগের মতো জিনিস সহজাতবৃত্তিবশে অপছন্দ করলেও তিনি লিখতে পেরেছিলেন : "রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা ; অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের দ্বিধা নেই।" 'ইজভেস্তিয়ার' সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০) "আপনারা যে মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন তার কতকগুলি

স্ববিরোধ” মীমাংসা করার কথা বন্ধু হিসেবে বলার মতো সততা তাঁর ছিল ; তিনি অনুরোধ করেছিলেন, সমাজতন্ত্রের শত্রুদের দিক থেকে প্রচণ্ড “বাধা” ও “নিরন্তর প্রবল শত্রুতা” থাকলেও সোভিয়েতরা হয়তো “দয়া ও ভালোবাসা দিয়ে (তাদের শত্রুদের) বদলাতে” পারে। “আপনাদের আদর্শ সুমহান, তাই সে আদর্শ পালন করতে গিয়ে তাকে ত্রুটিহীন করে তুলতে বলছি।” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনের ধরন-ধারনের বৈসাদৃশ্য তাঁকে পীড়িত করেছিল, সেখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন যে মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও তিনি আশা ও আনন্দের কোনো কারণ দেখতে পাননি। আরেকটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ “আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে” কিন্তু আমেরিকা সম্পর্কে ঃ “ধনের বোঝা কী প্রচণ্ড এবং কী অনর্থক।”

বাঙলাভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্যাপকতর প্রচারের জন্য সেগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত ব্রিটিশশাসিত ভারত সরকার তা নিষিদ্ধ করে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, কিন্তু পরাধীন ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী অপমান হজম করতে হয় ; বহু বছর ধরে, হয়তো ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের “রাশিয়ার চিঠি”-র বাঙালী ছাড়া আর কোনো পাঠক ছিল না। এটুকু করুণার জন্য বাঙালীরা ধন্যবাদ দিতে পারত শুধু কবির বিশ্বব্যাপী খ্যাতিকে, বিদেশী শাসকের কোনো উদারতাকে নয়। যাই হোক, এ সব কথা বহুবিদিত হয়ে পড়ে ; ভারত-সোভিয়েত সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার আলোকবর্তিকা রূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের ঘটনাটি পরে ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে — স্থূল সোভিয়েতবিরোধী কুৎসা প্রচার ভারতে আর সহজ থাকে না।

ই. ভি. রামস্বামী নাইকার ছিলেন একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ (সম্প্রতি নব্বই বছরেরও বেশি বয়সে মারা গেছেন, তাঁর মৃত্যুতে শোকাপ্লুত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ দক্ষিণ ভারতীয়। তাঁরা তাঁকে সস্নেহ-

শ্রদ্ধাভরে বলতেন "ইভো")। রবীন্দ্রনাথ বা নেহরুর মতো তিনি কোনোক্রমেই বিশ্ব-ব্যক্তিত্ব ছিলেন না. এমন কি ভারতের দক্ষিণাংশের রাজ্যগুলির বাইরেও তাঁর তেমন পরিচিতি ছিল না, কিন্তু সবদিক দিয়েই তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি; বহু দিক দিয়ে ভারতীয় হয়েও ভারতীয়ের মতো নন, গর্ব আর আপন অভিমতে ইতিবাচক, এমনকি প্রগতিশীল ভারতীয়রাও যেসব ঐতিহ্যের দোহাই পাড়েন সে-সব ঐতিহ্য সম্পর্কেও ভক্তিশ্রদ্ধাহীন, সামাজিক আচার প্রথা ও ধর্মমত সম্পর্কে কালাপাহাড়; দক্ষিণ ভারতে অন্ত্যজ জাতিগুলির জঙ্গী আন্দোলনের জনক; একদা গান্ধীর প্রতি প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপোস দেখে বীতশ্রদ্ধ হন; নিপীড়িত জনগণের প্রতি "ন্যায়বিচারের" (লোকহিতৈষণা নয়) যোদ্ধা, হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, "দ্রাবিড় কাঝাগাম"-এর অনুপ্রেরণাদাতা। দ্রাবিড় কাঝাগামই কিছুটা সংশোধিত রূপে "দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগামে (ডি এম কে)" পরিণত হয়। সবসময়েই বিতর্কিত, এমন কি কখনও কখনও অপ্রীতিকর এই ব্যক্তিটি দক্ষিণ ভারতে ছিলেন এক শক্তিস্বরূপ। সেই শক্তি এমনই যার বুঝি কোনো জুড়ি নেই। জনগণের উপরে তাঁর প্রভাব এখনও কার্যকর। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে, তিনি যখন তামিল "কুডি আরাসু (গণরাষ্ট্র) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং জাতিগত অসাম্য ও অন্যান্য সামাজিক পাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, তখন বিশেষ করে নাস্তিক্যবাদী কাজকর্ম সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য দুজন সহকর্মীকে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে চান। পাসপোর্ট না-মঞ্জুর হওয়ায় তাঁরা বে-আইনী ভাবে মিশর অভিমুখে যাত্রা করেন, সেখান থেকে যান গ্রীসে, পরে ওদেসায় গিয়ে পৌঁছন সোভিয়েত জাহাজ "চিচেরিন"-এ। ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ 'ভোকস' এই গোপন প্রতিনিধিদলটিকে মস্কোয় অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদের সফরসূচী স্থির করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক কমিটির চেয়ারম্যান কালিনিনের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন,

লেনিনগ্রাদ, দ্নিয়েপ্রোসত্রয়, জাপোরোজ্যিয়ে, রোস্তভ, ট্রান্স-ককেশিয় প্রজাতন্ত্র, আবখাজিয়ার মতো জায়গা ও অন্যান্য কৌতূহলোদ্দীপক স্থান দেখেন। রামস্বামী তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমরা কল্পনা করতে পারিনি যে জাতিসংক্রান্ত প্রশ্নটি এত সফলভাবে মীমাংসা করা যায়, জাতিগত বিরোধ কাটিয়ে ওঠা যায়।" "ডেজ অ্যাণ্ড ইয়ারস ইন ম্যাড্রাস" গ্রন্থের লেখিকা লুদমিলা শাপোশনিকোভা প্রায় নব্বই বছরের এই বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি কী বলেছিলেন তা লিখেছেন: "রাশিয়ায় কাটানো তিনটি মাস ছিল গোটা একটা জীবন, আমার জীবনের স্বপ্ন!" মাদ্রাজে ফিরে এসে এই কালাপাহাড় কমিউনিজমের বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কে ও ধর্ম বিষয়ে লেনিনের মতামত সম্পর্কে লিখেছিলেন। ব্রিটিশশাসিত ভারতের পুলিস তাঁকে সহজে রেহাই দেয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে খবর প্রচারের অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁর বিচার হয় এবং ন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি। "ইভো" সত্যের সন্ধানে গিয়েছিলেন; সুখের বিষয়, সোভিয়েত দেশে তাঁর গোপন ভ্রমণের যে-কাহিনী ভারতে অনেকখানি অজ্ঞাত ছিল, এ ইউনেল ও ই বরোভিকের মতো পণ্ডিতরা তা আবার উদ্ধার করেছেন।

*   *   *

শ্রমজীবী জনগণ যখন নিজেদের সত্তা খুঁজে পেতে শুরু করেন তখন সমাজ সম্পর্কে সত্য কথা জানা থেকে তাদের কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না। সুতরাং ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের একে অপরকে জানার পথে হিমালয়প্রমাণ বাধা সত্ত্বেও সত্যের প্রকাশ ঘটে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে। ১৯২৭ সালে ভারতে যে-আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার ফলে, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে গঠিত হয়েছিল শ্রমিক কৃষক সংগঠন, যেমন, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের লাল ঝাণ্ডা গিরনি কামগার ইউনিয়ন। এককালে এটিই ছিল এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রেড-ইউনিয়ন। বোম্বাই, কলকাতা, কানপুরে, রেলওয়ে

ওয়ার্কশপে ও চটকলে বহু উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট আন্দোলন হয় (১৯২৭-২৮) ১৯২৮ সাল থেকে মে দিবস, রুশ বিপ্লব দিবস (৭ নভেম্বর) ও লেনিন দিবস (মৃত্যু বার্ষিকী, ২১ জানুয়ারি) উদযাপন করার রীতি চালু হয়। কমিউনিস্টদের আত্মগোপন অবস্থায় কাজ করতে হত বলে বঙ্গ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি গঠিত হয় (১৯২৭-২৮)। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯২৮) শ্রমিকশ্রেণীর এক বিশাল মিছিল জোর করে ঢুকে পড়ে কিছু সময়ের জন্য প্যাণ্ডেল দখল করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত সভাপতি মতিলাল নেহরু ও অন্য নেতাদের কাছ থেকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর সেই মিছিল শান্ত হয়। জনগণের অসন্তোষ দূর করার জন্য আর কতটুকু "সংস্কার" দেওয়া যেতে পারে তা বিচার করার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গঠিত, ভারতে আগত সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমাদের মেহনতি জনগণের আন্দোলন প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা তেত্রিশজন নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট ও জঙ্গী ট্রেড-ইউনিয়নের কর্মীদের গ্রেপ্তার করে (২০ মার্চ ১৯২৯) এবং শুরু করে সেই মামলা যা বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করে 'মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' নামে। এই মামলাকে বলা যায় পর পর লাহোর, পেশোয়ার ও কানপুরের মামলা-নাটকের শেষ অঙ্ক। কমিউনিজমের নীতি সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ (এমন কি তার প্রতি বিরূপ) হলেও জাতীয় নেতৃত্ব বিচলিত হন। দিল্লিতে সীমিত কেন্দ্রীয় আইন সভায় সরকারের বিরোধীপক্ষের নেতা মতিলাল নেহরু ব্রিটিশ হোম মিনিস্টারকে বলেন; "বিভিন্ন চিন্তাধারা ভারতের বাইরে রাখবার জন্য আপনারা কি কাঁটা-তারের বেড়া আর কৃত্রিম বাধা তুলতে পারেন? যখন পারতেন, সে সময় চলে গেছে।"

বস্তুতপক্ষেই, প্রশাসনিক হুকুম দিয়ে চিন্তাধারা আটকে রাখার দিন চলে গিয়েছিল। কমিউনিজমের ক্রমবর্ধমান বিজয়ী নীতিকে ইতিহাস নিজে যে সুবিধা প্রদান করেছে মীরাট মামলা তাকেও তুলে ধরেছিল।

সবচেয়ে খ্যাতিমান ও কীর্তিমান আইনজীবীদের এই মামলায় নিয়োগ করা হয়েছিল, তাতে সরকারের অর্থব্যয়ও হয়েছিল প্রচুর। আর নিজেদের যারা সৃষ্টির কর্তা হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত সেই আমলাদের (ব্রিটিশ "ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস" নিজেকে অভিহিত করত "স্বর্গজাত" বলে) কাছে মোকদ্দমাসংক্রান্ত পরামর্শাদি পেয়ে সেই সব খ্যাতকীর্তি আইনজীবীরা আদালতে কমিউনিজমের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করতেন একেবারে নিরক্ষরের মতো (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কমিউনিজম সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় কৌঁসুলি ল্যাংফোর্ড জেমসের যুক্তিতর্ক পড়লে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়), আর অভিযুক্তরা—এঁদের বেশির ভাগই লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন—প্রাসঙ্গিক পুস্তকাদির সাহায্য নেওয়া প্রায় অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও সাহসিকতার সঙ্গে, মর্যাদা ও ক্ষমতার সঙ্গে তাঁদের কমিউনিস্ট প্রত্যয় প্রতিপাদন করেছিলেন, এবং বলতে গেলে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধেই ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মীরাট মামলার সওয়াল জবাবের সম্পূর্ণ বিবরণ আজও পাওয়া যায় না, কিন্তু সংক্ষিপ্তসার রূপে সামান্য যেটুকু চুঁইয়ে খবরের কাগজে স্থান পেয়েছিল তা শুধু কমিউনিজমের পক্ষেই নয়, তার অজেয় পতাকাবাহী সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেও ভালো ও কার্যকর প্রচার। একে অবশ্য বাড়িয়ে দেখা উচিত নয়, কারণ মীরাট মামলা শ্রেষ্ঠ প্রলেতারীয় নেতৃত্বকে জাতীয় দৃশ্যপট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল ; আবার সময়টা ছিল এমন যখন আন্দোলন তার শৈশবাবস্থায় থাকায় ট্রটস্কিবাদ ও অন্যান্য দুষ্ট উৎসের সঙ্গে যুক্ত সংকীর্ণতাবাদী গোষ্ঠীগুলি সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছিল। সেই সঙ্গে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মীরাট এক জল-বিভাজিকার প্রতীক ; সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা তখন ভারতীয় দৃশ্যপটের অঙ্গ হয়ে গেছে, সে আর ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো অপকারী শস্য নয় ; বরং ইতিহাসের নতুন ফসলের শিকড়, আর তার প্রথম সুন্দর ফল হিসেবে সোভিয়েত সত্যকার এক নতুন ও গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করতে শুরু করল।

পাঁচ

"সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আগে থেকেই আমাদের মনে যে ভালোবাসা ছিল, জেলখানায় পড়াশোনার ফলে তা গভীর হয়ে ওঠে, অক্টোবর বিপ্লবের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা সোভিয়েত ইউ-নিয়নের সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সমর্থনের শপথ জানিয়ে শুভেচ্ছা পাঠালাম।" এই কথাগুলি আছে অজয় ঘোষের উপভোগ্য পুস্তিকা "ভগৎ সিং অ্যাণ্ড হিজ কমরেডস"-এ (১৯৪৫, পৃঃ ১৩)। ১৯৬২ সালের গোড়ার দিকে অকালমৃত্যুর সময় পর্যন্ত অজয় ঘোষ ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯২৫ সালের পর থেকে ছিলেন ভগৎ সিংয়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। রুশ বিপ্লব ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উপরে গভীব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই আন্দোলনের প্রতিনিধি-স্থানীয় ছিলেন ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ ও সূর্য সেনের মতো ব্যক্তিরা। শেষোক্তজন ছিলেন কিংবদন্তীসুলভ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের (১৯৩০) নেতা। ১৯৩০ সালের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বহুসংখ্যক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীকে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপের দুর্গে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। এই বিপ্লবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেখানে "কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন" গঠন করেন। অনেকে মুক্তি লাভের পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আর কমিউনিস্ট পার্টি বলতে গেলে জন্মক্ষণ থেকেই বে-আইনি ছিল, ১৯৩৪ সালে তাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হলো। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর উত্তাল জোয়ার ঠেকাবার কোনো উপায় ছিল না; ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি দুটি সোভিয়েত পাঁচ-সালা

পরিকল্পনার বিপুল সাফল্য ও নতুন সোভিয়েত সংবিধান চালু হওয়ার খবর যখন আর চেপে রাখা গেল না, গণ আন্দোলনের তীব্রতায় এক নতুন উদ্যম দেখা দিল। শুধু কমিউনিস্ট আর প্রগতিশীল জাতীয়তা-বাদীরাই নয়, সেই সময়কার সংস্কারপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ক্রমাগত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। লেনিন, অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করা হতো না এবং তা শুনে হর্ষধ্বনি উঠত না এমন সভা বা সমাবেশ বড় একটা হতো না বললেই চলে।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে সারা দেশ জুড়ে গড়ে ওঠে সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলন (সারা ভারত কিসান সভা)। ভারতে প্রথম সংগঠিত ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনও (সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন) এই সময়কার ঘটনা, এই আন্দোলনের মর্মবাণী ছিল "স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি।" ১৯৩৫-৩৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে লেখকদের এক শক্তিশালী আন্দোলন, সারা ভারত প্রগতি-লেখক সংঘের জন্ম হয় ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে। কিছুকাল পরে, ১৯৪৩ সালে দেখা দেয় "গণ নাট্য" আন্দোলন (আই পি টি এ)। সাম্রাজ্যবাদ লীগ অব নেশনস-এ ও অন্যত্র যাকে মদত দিচ্ছিল সেই ফ্যাশিবাদের মারাত্মক বিপদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত গঠন ত্রিশের দশকের এক স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। আবি-সিনিয়ার (ইথিওপিয়া) উপরে মুসোলিনির আক্রমণ, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ, মাঞ্চুরিয়া ও চীনের স্বাধীনতার উপরে জাপানের আক্রমণ, নতুন একটা বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার তৎকালীন নেতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও প্রস্তুতির মতো ঘটনার বিরুদ্ধে গণ অভিযান ও প্রতিবাদ আন্দোলন তখন ছিল নিত্যকার ব্যাপার।—এ-ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণী আর তার ঘনিষ্ঠ মিত্ররা একাই শুধু নেতৃত্ব দেয়নি। প্রধানত জওয়াহরলাল নেহরুর কল্যাণেই কংগ্রেস এক দ্ব্যর্থহীন ফ্যাশিবাদবিরোধী লাইন গ্রহণ করেছিল; স্পেনেই হোক অথবা চীন কিংবা চেকোশ্লোভাকিয়াতেই হোক, অথবা যেখানেই ফ্যাশিস্ত লুঠেরারা

হাজির হোক না কেন জওয়াহরলাল ভারতের কম্বুকণ্ঠরূপে সারা পৃথিবীকে আমাদের বেদনার কথা, আমাদের ক্রোধের কথা জানিয়েছেন। হিটলারি ফ্যাশিস্তরা যখন অতি সহজেই ছোঁ-মেরে ভিয়েনা দখল করে নেয়, জওয়াহরলাল তখন লিখেছিলেন যে তিনি ঘুমোতে পারেননি, কারণ তিনি যেন সেই ঐতিহাসিক নগরীতে বর্বরদের কুৎসিত পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। ভারতের মত ব্যক্ত করার জন্য তিনি ছুটে গেছেন স্পেনে, চীনে, গেছেন যেখানে পেরেছেন সেখানেই। এই ফ্যাশিবিরোধী ধর্মযুদ্ধে তাঁকে সবচেয়ে ভালোভাবে সাহায্য করেছিলেন আরেক অমর মহামানব —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কালপর্বের বিশেষ ঘটনা হলো ১৯৩৬ সালের লখনৌ কংগ্রেস, সেখানে নেহরুর বক্তৃতায় জোর দেওয়া হয় ভারতের দুরবস্থা দূর করার উপায় হিসেবে সমাজতন্ত্রের উপরে, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের উপরে, আফ্রো-এশীয় উপনিবেশবাদবিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে ভারতের মেলবন্ধনের উপরে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীর উপরে। ফৈজপুরে অনুষ্ঠিত পরবর্তী কংগ্রেসে বলা হয় যে ফ্যাশিস্ত আগ্রাসন বৃদ্ধি লাভ করেছে এবং সেখানে "পৃথিবীর দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ জাতিগুলির সঙ্গে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের সংহতি" ঘোষণা করা হয় (দ্র. এস জি সরদেশাই, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯১)।

আগেই বলা হয়েছে, সোভিয়েত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ভারতের উপরে গভীর রেখাপাত করেছিল। নেহরু স্বয়ং পরিকল্পনার ধারণা জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে "পিয়াতিলেতকা" (অর্থাৎ প্রথম পাঁচ-সালা পরিকল্পনা) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র বসু একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি নিযুক্ত করেন, তার চেয়ারম্যান—নেহরু, সম্পাদক—কে টি শাহ, সদস্য—মেঘনাদ সাহার মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। ভারতে পরিকল্পনার বিষয়টা তিনি কি রকম চিন্তা করছেন, কলকাতায় এক আলোচনাচক্রে এ প্রশ্ন করা হলে সুভাষচন্দ্র সোভিয়েত দৃষ্টান্তের সপ্রশংস উল্লেখ করে

বলেন যে ভারত এতদিন পশ্চাৎপদ ছিল, তার একটা 'forced march' দরকার। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার জন্য এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রচণ্ড পরিবর্তনের দরুন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি তার কাজ শেষ করতে পারেনি বটে, কিন্তু অনেকগুলি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল, তাতে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রভাব এবং সোভিয়েত অভিজ্ঞতার প্রভাবের অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্ভিন্ন সমাজবিপ্লবের বিরুদ্ধে নিজেদের শেষরক্ষার উপায় হিসেবে সাম্রাজ্যবাদীরা যাদের লালিত করছিল, সেই ফ্যাশিবাদের ভয়ঙ্কর বিপদ ভারত তখন উপলব্ধি করছিল। এই চেতনা বাড়ছিল যে ফ্যাশিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী হাতিয়ার। ভারতের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সংবেদনশীল মনের অধিকারীরা যেন প্রস্তুত ছিলেন মহান রোম্যাঁ রলাঁর সেই চমৎকার উক্তির প্রতিধ্বনি করতেঃ "আমি জানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন হলো সমাজ প্রগতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি, মানবজাতির সুখ রয়েছে তার প্রহরাধীনে, সে আমাদের জীবন্ত দুর্গ। আর তাই আমি বলি—হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা, নয় মৃত্যু!"

* * *

একথা আবার বলা দরকার যে ভারতের ব্রিটিশ শাসকরা তাদের সাধ্যায়ত্ত সর্বপ্রকারে শুধু যে সোভিয়েতের অপযশ রটনারই চেষ্টা করছিল তাই নয়, সমস্ত বেড়া ডিঙিয়ে তখন যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল তা থেকে আমাদের মনকে পুরোপুরি রুদ্ধ করে রাখার চেষ্টাও করছিল। জাপানী প্রতিক্রিয়াশীলরা তখন যাকে বলত "বিপজ্জনক চিন্তা", তা যাতে আমাদের অধিগম্য না হয় সেজন্য ভারতের সরকার দীর্ঘকাল প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল। সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো বই পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এই প্রসঙ্গে, বর্তমান লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অতি তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা মনে পড়ছে। সম্ভবত ১৯২৯ সাল থেকে কয়েক বছরের

জন্য অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ (পরে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি হন) ছিলেন লীগ অব নেশনস্‌-এর ইণ্টারন্যাশনাল ইণ্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটিতে ভারতের প্রতিনিধি। সেই হেতু, তিনি যখন সফর করতেন তখন কূটনৈতিক বিশেষ সুবিধা তিনি ভোগ করতেন, তাঁর মালপত্র কাস্টমস পরীক্ষা করত না। এ জন্য তিনি যতবারই যেতেন সমাজতন্ত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বই ইওরোপ থেকে নিয়ে আসতেন। এ সব বই সাম্রাজ্যবাদী কাস্টমস-এর বেড়া কোনোকালেই অতিক্রম করতে পারত না। বহু বিচিত্র বিষয়ে বুদ্ধিগতভাবে আগ্রহী ও খোলা মনের অধিকারী এই মানুষটি সাহায্য করতে কখনোই ইতস্তত করেননি ; "নিষিদ্ধ" বইগুলি পড়ার পরে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের (তখন তিনি ছিলেন সেখানকার উপাচার্য) লাইব্রেরির নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতেন। বর্তমান লেখক প্রত্যক্ষভাবেই জানেন যে এই লাইব্রেরিতেই ছিল এককভাবে ভারতে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। এ কথাটাও বোধহয় যোগ করা দরকার যে পরবর্তী উপাচার্য মহাশয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতের পুলিসের হাতে সেই "নিষিদ্ধ মাল" তুলে দেন—কাজটা নিতান্তই লজ্জাজনক, পরাধীনতার নীচ মানসিকতার পরিচায়ক।

১৯৩৪ সালে অথবা তারই কাছাকাছি সময়ে আসে সিডনি ও বিট্রিস ওয়েব-এর মহাগ্রন্থ—"সোভিয়েত কমিউনিজম : এ নিউ সিভিলিজেশন ?" পরবর্তী সংস্করণে জিজ্ঞাসা-চিহ্নটি বাদ দেওয়া হয় এবং ১৯৪১ সালের পুনর্মুদ্রণে বিট্রিস ওয়েবের এক চমৎকার মুখবন্ধে বলা হয় যে সোভিয়েতগুলি হল "পৃথিবীতে সবচেয়ে ব্যাপক ও সমানীকৃত গণতন্ত্র।" ইংরেজি-ভাষী দুনিয়ায় এটা ছিল রীতিমত একটা ঘটনা, কারণ ওয়েব-দম্পতি ছিলেন বহুলপরিমাণে এর মহত্তম সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকারী ; ইতিপূর্বে তাঁদের দীর্ঘকালের ফেবিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি হেতু তাঁরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি কিছুটা বিরাগই পোষণ করতেন। তাঁদের "বিশ্বাস-ঘাতকতায়" ক্রুদ্ধ লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকা এক কঠোর সমালোচনায়

মন্তব্য করেছিল যে এই বৃদ্ধ দম্পতির ভীমরতি ধরেছে বলেই সোভিয়েত "রেজিমেণ্টেশন" পছন্দ করেছেন, "মৌমাছির প্রজাতন্ত্র" পছন্দ করছেন! এই ঘৃণা বোধগম্য ছিল, কারণ চমৎকার দলিলপত্র উপস্থিত করে এবং সন্ধানী, বিশদ কখনও বা ঈষৎ সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণের সাহায্যে ওয়েব দম্পতি মানবেতিহাসে প্রচণ্ডতম কৃতিত্বের এক উজ্জ্বল ছবি চিত্রিত করেছিলেন। চিরায়ত রচনা হিসেবে এই বইটি কোনদিনই সেকেলে হবে না, যদিও স্বভাবতই বহু বছর বিগত হওয়ার ফলে তার এক কালের বিরাট গুরুত্ব অবশ্যম্ভাবী রূপেই কিছুটা খর্ব হয়েছে।

ব্রিটেনে ওয়েব-দম্পতির লেখা একটি বই নিষিদ্ধ করা যায়নি, কিন্তু পরাধীন ভারতে গিয়েছিল। দু-এক কপি কোনোমতে চলে এসেছিল, ফলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল; জওয়াহরলাল নেহরু তাঁর বক্তৃতায় এর উল্লেখ করেন এবং সে সময়ে—সব সময়ের মতোই—একা কিন্তু অদম্য ভাবে ফ্যাশিবাদের দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এক নতুন, প্রখর আগ্রহ দেখা দেয়। ওয়েব দম্পতির মহৎ গ্রন্থটির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য 'সী কাস্টমস অ্যাক্ট' প্রয়োগ করা হয়, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা এই অন্যায় অবিচারে হতচকিত হয়ে যান। ১৯৩৬ সালে এক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং সরকারের কাজের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জওয়াহরলাল নেহরু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু প্রমুখ ভারতীয় জীবনে যা-কিছু সৃষ্টিশীল তার প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরযুক্ত এক ইশতেহার প্রচারিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার ইতিহাসে এই ইশতেহারটি বস্তুতই এক দিক্‌চিহ্ন।

একথা স্মরণ করতে আনন্দ হয় যে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৩ তারিখে সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে গান্ধীর "মনোনীত উত্তরাধিকারী" রূপে পরিচিত জওয়াহরলাল নেহরু অসাধারণ তীক্ষ্ণতা ও প্রচণ্ডতায় ঘোষণা করেছিলেন: "আমি মনে করি আজকের পৃথিবীর সামনে মূলত কোনো এক ধরনের কমিউনিজম আর কোনো এক ধরনের ফ্যাশিবাদের

মধ্যে একটা বেছে নেওয়ার ব্যাপার রয়েছে; আর আমি পুরোপুরি প্রথমটির পক্ষে, অর্থাৎ কমিউনিজমের পক্ষে। ফ্যাশিবাদকে আমি প্রচণ্ডভাবে অপছন্দ করি; বস্তুত যে কোনো মূল্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা স্থূল ও পাশবিক প্রচেষ্টার চাইতে বেশি কিছু বলে আমি একে মনে করি না।···আমি মনে করি কমিউনিজনের মূল মতাদর্শ ও তার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের ব্যাখ্যা যথার্থ।'' (সরদেশাইয়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৭) নেহরুর কানাডীয় জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার তাঁর চিন্তার এই দিকটিকে অসূয়াভরে ঠাট্টা করেছেন "মোহাচ্ছন্নতা" (infatuation) বলে, যা নাকি "অন্তত কুড়ি বছর ধরে টিকে ছিল" কিন্তু তা ছিল নেহেরুর সত্তারই অংশ। মার্কসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাসংশয় ছিল সন্দেহ নেই; কিছু কমিউনিস্টকে, তাঁর মতে যাঁরা অতিসরল সামান্যীকরণ করতেন, তাঁদের তিনি সইতে পারতেন না। এঁদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে এঁদের "অপরকে বিরক্ত করার এক অদ্ভুত কায়দা" ছিল; কিন্তু লেনিনের "অর্গ্যানিক সেন্‌স অব লাইফ", জনসাধারণের পাশাপাশি "ইতিহাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার" ধারণা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল; ক্ষমতাসীন নেহেরুকে (১৯৪৭-৬৪) লক্ষ করে ভারতীয় সমালোচকরা তাঁর 'গীতিকাব্যধর্মী সংগীতের' কথা, যা সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অথচ অপ্রিয় ব্যবস্থা সংগঠিত করা ও সুকঠোর চিন্তার কোনো বিকল্প নয়' তার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু নেহরুর চিন্তা (এবং অনেক কাজও) উপযুক্ত কারণেই জাগরূক থাকে। ১৯৩৬ সালে এলাহাবাদে এক ক্ষুদ্র ও ঘনিষ্ঠ তরুণ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তিনি জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্কের কথা যে ভাবে বলেছিলেন তা জওয়াহরলাল ছাড়া আর কেই বা বলতে পারতেন—তিনি বলেছিলেন, ব্যাপারটা এমন নয় যেন প্রথমে একটা লাড্ডুর দিকে হাত বাড়ালাম, সেটা খেয়ে আবার হাত বাড়িয়ে দিলাম আরেকটার

জন্য ; দুটোকে একই সঙ্গে নেবার চেষ্টা করতে হবে তারপরে ঘটনা পরম্পরা স্বাভাবিক ভাবেই যেমন যেমন হওয়া দরকার তেমনটি হবে !

আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়ায় ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত (১৯৩৯) কংগ্রেস অধিবেশনে ম্যুনিখ বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করা হয় ; স্পেন, আবিসিনিয়া, চীন ও অন্যান্য বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী বেইমানি এবং বিশেষ করে ফ্যাশিবাদের প্রতি ব্রিটিশ সাহায্য ও মদতের নিন্দা করা হয়। ভারতে আমাদের পক্ষে একথা বলা মোটেই অতিরঞ্জন ছিল না যে বিশ্ব রাজনীতির ঊষর ক্ষেত্রে সোভিয়েত ছিল আশা ও অগ্রগতির মরূদ্যান স্বরূপ।

১৯৩৬ সালে (কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে একই সময়ে লখনৌতে, মার্চ মাসে) সূত্রপাত হয় সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের। এর প্রস্তুতি হয়েছিল ১৯৩৬ সালে ভারতব্যাপী আলোচনায়। সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘ উদ্বোধন করেন কংগ্রেসেব প্রাক্তন সভা-নেত্রী কবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং সভাপতিত্ব করেন হিন্দু-উর্দু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখক প্রেমচন্দ। আশীর্বাণী এসেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাল্লাথোল আর নিরালার কাছ থেকে ; উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করেছিলেন (মৌলানা) হসরত মোহানির মতো দেশপ্রেমিক ও কবি প্রমুখেরা। প্রস্তুতিমূলক কাজ দীর্ঘকাল ধরে করেছিলেন মুলকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর ও অন্যান্যরা তাঁদের সকলের নাম এই স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ফয়েজ ও আহমেদ ফয়েজ যশপাল, সুমিত্রানন্দন পন্থ ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মাজাজ ও 'শ্রী শ্রী'। এই সম্মেলন এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ১৯শ শতাব্দীর মহৎ রুশ লেখকদের রচনার ধারা অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের লেখক ও শিল্পীদের কৌতূহল ও আগ্রহের মধ্যে সোভিয়েতের সঙ্গে যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম ব্যাপকভিত্তিক সারা-ভারত কাজটি ছিল ম্যাক্সিম গোর্কির স্মৃতিতে সর্বত্র

সভা-সমিতি করা। তাঁর মৃত্যুর (২৬ শে মার্চ ১৯৩৬) খবর এসেছিল প্রচণ্ড শোকাবহতা নিয়ে। এতে যে সাড়া পাওয়া গেল তা এত ব্যাপক ও গভীর যে কলকাতার 'স্টেটসম্যানের' মতো বৃহৎ পুঁজির পত্রিকা ম্যাক্সিম গোর্কির স্মরণসভার ছদ্মবেশে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র চলছে বলে সোরগোল তুলেছিল! এদেশ অবশ্য মেহনতী মানুষের বিশ্বব্যাপী পুনরভ্যুত্থানের অন্যতম মহৎ অনুপ্রেরণাদাতা হিসেবেই শুধু গোর্কিকে সেলাম জানায়নি; গোর্কির নেতৃত্বে সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসের (মস্কো ১৯৩৪) কথা, স্বদেশের বহু বিচিত্র, বহুজাতিক জীবনের অঙ্গরূপে লেখকদের কথা, যে সাহিত্য মানুষকে মহিমমণ্ডিত করে ও শক্তি যোগায় তার কথাও আমরা তখন জেনেছি, —সুমেরু সাগরের নিঃসীম বিস্তারে অসহায় সেই 'চেলিউশকিন' মরু অভিযাত্রীর (পাইলটেরা যাদের উদ্ধার করেছিলেন এবং সেই পাইলটরাই 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' হন সর্বপ্রথম) ভাসমান তুষারস্তরে নিরুদ্দেশ চলা, যারা সান্ত্বনা ও শক্তি পেয়েছিলেন মাত্র চারটি বই থেকে। পুশকিনের প্রোজ্জ্বল কবিতা মেরুরাত্রির নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করেছে আর শলোখভের 'ধীরে বহে ডন' এর কয়েকটি অধ্যায় সাহসী অভিযাত্রীদের কাছে পড়ে শোনাবার সময় যেন প্রতিধ্বনি তুলেছে —সেই কংগ্রেসে এই রিপোর্ট কি সুন্দর মর্মস্পর্শী মনে হয়েছিল।

তুটি একটি চোরাপথে আসা 'ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার' ('সেভিয়েত লিটারেচারের' পূর্বসূরী) -এর কপির জন্য অনেকে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করত, ভাগাভাগি করে পড়ত। জোশুয়া কুনিৎজের 'ডন ওভার সমরখন্দ' এর মতো বই কোনো মতে কাস্টমসের জাল এড়িয়ে আমাদের জানাত মধ্য এশিয়ায় নতুন জীবনের কথা, যেখানকার জীবনের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে আমাদের এত মিল। অথচ সেখানে এমন এক রূপান্তর ঘটেছে যা আধুনিক কোনো রূপকথার বিষয়বস্তু হতে পারত। হয়তো ওয়ালটার ডুরান্টির 'রাশিয়া রিপোর্টেড ১৯২৩-৩৪' এর অর্থপূর্ণ তথ্যানুসন্ধান আমাদের উপলব্ধিতে সাহায্য করত। ত্রিশের দশকের

'বিশ্বাসঘাতকতার বিচার' যখন বৈরী প্রচারকে প্রচুর রসদ জুগিয়েছিল তখন, ধরুন, ডি এন প্রিটের কাছ থেকে কিছু পেতাম, যাতে অবস্থার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেত কিংবা হয়তো তদন্তের সততা সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিসের রিপোর্টের একটি কপি পেয়ে যেতাম— ভাগ্যবান হলে ট্রটস্কিপন্থী ও অন্যান্যদের বিচারের আক্ষরিক বিবরণ-সংবলিত সোভিয়েত রচনাদির মতো দুর্লভ বস্তুও হাতে এসে যেত। ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রালের ডিন, হিউলেট জনসনের মর্মস্পর্শী অথচ আগাগোড়া বিষয়গত বিশ্লেষণমূলক রচনা 'দ্য সোশ্যালিষ্ট সিক্সথ অব দ আর্থ' হাতে এসেছিল বহুকাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদের মতো। রজনী পাম দত্তের 'ইণ্ডিয়া টুডে' (১৯৩৯) সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও গোপনে সাইক্লোস্টাইল করা অবস্থায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা থেকে মূল্যবান বহু খবর সংগ্রহ করা যেত, যেমন ভারত ও তার নিকটতম সোভিয়েত প্রতিবেশী তাজিকিস্তানের মধ্যে প্রগতির ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য। সন্দেহ নেই, সোভিয়েত সম্পর্কে সত্যকথা জানাটা ছিল এক সংগ্রাম বিশেষ, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় মিত্রদের তৈরী প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আমাদের দেশের মানুষ অন্তত অস্পষ্টভাবেও এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের সপারিশ্রমিক কাজ করার অধিকার আছে, নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টার সবেতন বিশ্রাম ও ছুটির অধিকার আছে, সর্বপ্রকার শিক্ষা বিনাব্যয়ে ও সীমাহীন মাত্রা পর্যন্ত লাভ করার অধিকার আছে এবং সর্বোপরি প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনের সমস্ত পতনে-উত্থানে তাদের জন্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। ওয়েব দম্পতি লিখেছিলেন, 'মানুষের এই সমস্ত নতুন ও অভূতপূর্ব অধিকার সার্বিকভাবে নিশ্চিতিপ্রদত্ত, ব্যক্তিগত কোনো বীমার প্রিমিয়াম ছাড়াই. স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণ বা সামাজিক অতীত নির্বিশেষে যে কোনো শহর বা গ্রামের সমস্ত অধিবাসীর জন্য বিশাল মহাদেশব্যাপী প্রায় ২০০ উপজাতির পশ্চাৎপদ মানুষও তার মধ্যে পড়ে।' এইভাবে, ১৯৩৭ সালে বর্তমান লেখক বাংলাভাষায় প্রগতিশীল রচনার একটি সংকলন প্রকাশে সাহায্য

করতে পেরেছিলেন। এই সংকলনের মধ্যে ছিল আলেকজান্দর ব্লকের 'দি টুয়েলভ' (মূল রুশভাষা থেকে) এবং উজবেকিস্তানের গফুর গোলাম এবং কাজাখস্তানের কারাবিয়েভ-এর কবিতার অনুবাদ। কাজাখস্তানের চারণ কবি সারা সোভিয়েত দেশে বন্দিত। যাঁর বিচিত্র জীবনে একটি ঐতিহাসিক যুগ বিধৃত সেই অক্ষরজ্ঞানহীন প্রতিভা মহাকবি জামবুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল।

ভারতের প্রগতিশীল মানুষ যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল তারার সঙ্গে তাঁদের ভাগ্যকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন সেই দুরূহ, উত্তেজনাময়, কখনও বা বিপজ্জনক কিন্তু সর্বদাই কিছু প্রাপ্তির চরিতার্থতায় ভরা সেই দিনগুলির স্মৃতিচারণার প্রলোভন সামলানো দরকার (সে স্মৃতিচারণ শুধু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াই নয়, অন্তহীন হয়ে ওঠারও বিপদ আছে)। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার জাগরণ প্রতিফলিত হয়েছিল "বামপন্থী" শক্তিগুলির অগ্রগতিতে এবং কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিতে। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ, ১৯৩৯ সালে তা বেড়ে হল ৫০ লক্ষ। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশেই ভারতের জনগণ সাধারণভাবে সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসায় কর্ণপাত করতে রাজী হননি, যেন সহজাত বুদ্ধিতেই অনুভব করেছেন যে সোভিয়েত তাদের বন্ধু। এই প্রশ্নে অন্তত "ন্যাশনাল ফ্রন্ট" বা "জাতীয় মোর্চা" ধরনের একটা কিছু দেখা দিয়েছিল। প্রসঙ্গত ১৯৩৮-এর গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট পার্টি এই নামেই একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির উপরে তখনও নিষেধাজ্ঞা ছিল বটে কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি এবং অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পার্টি তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করাতে সমর্থ হয়েছিল। তখনকার আন্তর্জাতিক বিপদ সম্পর্কে ভারতের মুক্তিকামী শক্তিগুলি সচেতন ছিল, তাই হরিপুরায় (১৯৩৮) কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত কোনোপ্রকার অংশগ্রহণ করবে না এবং ভারতের জনবল ও সম্পদ যুদ্ধে লাগানোর কাজে বাধা দেবে।

*   *   *

অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রচণ্ড ও নিরন্তর মিথ্যাভাষণ সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের সহজাত ছিল; হিটলার যখন নাটকীয়ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তি (অগস্ট ১৯৩৯) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল, তখন ক্রমবর্ধমান ভারত-সোভিয়েত সম্প্রীতির উপরে বড়ো একটা ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৩১ সাল থেকে চীন, আবিসিনিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া পশ্চিমের তথাকথিত "গণতন্ত্রের' দ্বারা লালিত ও পুষ্ট ফ্যাশিবাদের শিকার হয়ে আসছিল। ম্যুনিখে (১৯৩৮) চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করা হল বেদনাদায়কভাবে, তার কয়েক মাস পরে স্বাধীন দেশ হিসেবে তার অস্তিত্ব মুছে দেওয়া হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে ফ্যাশিবাদকে রোখার জন্য, পরাস্ত করার জন্য বারবার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীলরা চরম প্ররোচনামূলক অসৌজন্য ও দ্বিধা দেখিয়ে সমস্ত সোভিয়েত প্রস্তাব বানচাল করেছে; কার্যত হিটলারকে সংকেত দিয়েছে যে সে যদি সমাজতন্ত্রের উপরে হামলা চালায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী দুনিয়ার কাছ থেকে কোনো মদত পাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ইতিহাসে কঠিনতম উভয়-সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তখন; নিজের প্রতিরক্ষার জন্য সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে রাজী হল, অথচ পশ্চিমী দুনিয়া সে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিশ্ব রাজনীতির প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অনেকখানি অনবহিত থাকায় এবং 'পশ্চিমী' প্রচারের চতুর প্রতারণায় ভারতের জনমত এতে বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা কিছুদিনের জন্য মাত্র। হিটলার পোল্যাণ্ড দখল করে নেবার পর এবং ফ্রান্সের মতো গর্বিত দেশ নতি স্বীকার করার পর মাসের পর মাস ধরে মিত্রপক্ষ চালিয়ে গেলেন, সে-সময়ে ব্যাপক-ভাবে যাকে বলা হত, "ফোনী ওয়ার" বা লোক-দেখানো যুদ্ধ। ১৯৩৯-৪০ সালের শীতকালে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সজাগ প্রহরায় রত

সোভিয়েতকে যখন লেনিনগ্রাদ থেকে কুড়ি মাইল দূরে একটি অশুভ শত্রু-ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুখ্যাত ম্যানারহাইমের অধীনস্থ ফিনিশ (ও বিদেশী) ফ্যাশিস্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল, তখন প্রচণ্ড সোরগোল উঠেছিল। এ ব্যাপারটাও আবার সারা পৃথিবীর বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছিল, এমনকি, কিছুকালের জন্য (যতদিন পর্যন্ত না মীমাংসার শর্তে সোভিয়েত ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া গেল) জওয়াহরলাল নেহরু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাকেও তা বিষিয়ে দিয়েছিল। যে লীগ অব নেশনস উপর্যুপরি ফ্যাশিস্ত আগ্রাসন সত্ত্বেও তার মোকাবিলা করার জন্য কড়ে আঙুলটিও নাড়েনি, তারা কালবিলম্ব না করে বৈঠকে মিলিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বহিষ্কৃত করল। ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা বস্তুতই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে নিজেদের জড়িত করার উপরে অনেকখানি ভরসা করেছিল, যাতে হিটলার জার্মানি তাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হয়ে তাদের জেহাদে যোগ দেয়। "পশ্চিমী" গণতান্ত্রিক সরকারগুলিতে ছিল "তোষণকারী" ফ্যাশিস্ত সমর্থক ও প্রায়-ফ্যাশিস্ত লোকজন, হিটলার যে তার ডেপুটি হেসেকে ব্রিটেনে পাঠিয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল তাদের এবং তাদের ক্ষমতা-সম্ভাবনা বাজিয়ে দেখা। ইতিহাস কিন্তু এগিয়ে চলছিল দ্রুতগতিতে। "পশ্চিমী" শাসকশ্রেণী সোভিয়েতের প্রতি তাদের ২৩ বছরের শত্রুতা ত্যাগ করতে বাধ্য হল। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে হলেও, ফ্যাশিবিরোধী মোর্চার শরিক হতে বাধ্য হল। যেমন উইনস্টন চার্চিল, বিশ্ব-আধিপত্যের ইঙ্গ-ফরাসী পরিকল্পনায় ছোট শরিক হতে উদ্ধত হিটলার রাজী হচ্ছে না দেখে এবং বিশ্বাসঘাতক ধনিক সম্প্রদায়ের কলাকৌশলে পঙ্গু ফ্রান্সের যে-শোচনীয় দ্রুততায় নাৎসি আক্রমণের সামনে পতন ঘটল তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানান "ব্রিটেনের লড়াই" লড়ার জন্য; আর হিটলার যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল তখন যেদেশের প্রচণ্ড বিরোধিতা চিরকাল তিনি করে এসেছেন তার সঙ্গেই হাত মেলালেন।

২২ জুন ১৯৪১ তারিখের ভোরবেলা বিশাল নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রবেশ করল। তাদের প্রধান ভরসা ছিল আকস্মিকতা ও দ্রুতগতি। তারা ভয়াবহ আকারে সঙ্গে নিয়ে এল মৃত্যু আর ধ্বংস। তাদের শ্রেণীবন্ধুদের কথায়, তাদের আশা ছিল মাখনের মধ্যে দিয়ে ছুরি চালানোর মতো অতিসহজেই তারা এগিয়ে যাবে, সোভিয়েতকে নতজানু হতে বাধ্য করবে। লাল ফৌজ যখন এই ভয়ঙ্কর 'ব্লিৎজ'-এর মুখোমুখি মোকাবিলা করল, চার্চিল পর্যন্ত তখন বলেছিলেন, "প্রায় সমস্ত দায়িত্বশীল সামরিক অভিমত" অনুযায়ী "রুশ সেনাবাহিনী শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং অনেকাংশে বিধ্বস্ত হবে।" কিন্তু এই সব ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে গেল কারণ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সোভিয়েত প্রত্যুত্তর ছাড়াও ফ্যাশিবাদ-কবলিত ইওরোপের শ্রমিকরা প্রতিরোধ আন্দোলনে অবতীর্ণ হলেন, ফ্যাশিবাদকে ধ্বংস করার জন্য সমগ্র বিশ্বে শুধু বামপন্থীদেরই নয় অন্যান্য প্রগতিশীল জনসাধারণেরও সমাবেশ ঘটল। বেআইনী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করল, "পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা আর ইতিহাস তৈরি করছে না, তাদের জুড়ে দেওয়া হচ্ছে ইতিহাসের রথের সঙ্গে।" আর, যুদ্ধের ঘোর তমসাচ্ছন্ন মুহূর্তে ব্রিটেনে জর্জ বার্নার্ড শ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন: "রাশিয়া যখন হিটলারকে পর্যুদস্ত করবে, সে হয়ে উঠবে বিশ্বের আত্মিক কেন্দ্র।"

ছয়

১৯৪১ সালের ২৩ জুনের কথা স্মরণ করা খুব কঠিন নয়। কারণ সেদিনের স্মৃতি অনেক ভারতবাসীর অন্তরে এমনভাবে গাঁথা আছে যে তা কখনও মোছবার নয়। হিটলার দস্যুতামূলক আক্রমণের সংবাদ যখন বেতারে প্রচারিত হয়, তখন আমাদের উপর দিয়ে যে আবেগের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, তা আমরা অনেকেই তীক্ষ্ণতা এবং গর্ব সহকারেই স্মরণ করতে পারি। সন্দেহের অবকাশ নেই যে আমরা খুবই উদ্বেগ বোধ করছিলাম। কারণ আকস্মিক আক্রমণের সমস্ত সুযোগসুবিধাই পেয়েছিল হিটলার, আর তার হাতে ছিল যথাযথভাবে সুসজ্জিত রণদক্ষ এক বিরাট সেনাবাহিনীর পৈশাচিক শক্তি। কিন্তু সোভিয়েত সুহৃদদের মনে ছিল সীমাহীন আশাবাদ। সমাজতন্ত্রের মৌলিক ও বৈপ্লবিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন সোভিয়েত সুহৃদরা জানতেন এবং সুনিশ্চিতভাবেই জানতেন সোভিয়েত ইউনিয়ন হারবে না, কখনও হারতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকেও (তাঁর মৃত্যু ১৯৪১ সালের অগস্ট মাসে) বারংবার সেই কথাই বলেছিলেন—সোভিয়েত হারবে না, হারতে পারে না।

কলকাতায় হিটলারের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেঁাছবামাত্র আমরা কয়েকজন একটা বৈঠকে মিলিত হই। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব বন্দী রাধারমণ মিত্র এই সংবাদ শুনে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুতে থাকে। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনক্রমেই হারতে পারে না— তাহলে ভারতের মুক্তির কি হবে? সেই আমরা সোভিয়েত সুহৃদ

সমিতির একটা সংগঠন কমিটি গঠন করে ফেলি। চেয়ারম্যান হন স্বনাম-ধন্য স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। আজীবন স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ দত্ত একজন পথিকৃৎ মার্কসবাদী পণ্ডিত। লেনিনের জীবনকালেই ইনি মস্কোয় গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ছাড়া এই ধরনের কোন কাজেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর কাছেও যাওয়া হলো! অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির (এফ এস ইউ) পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মত হন। জওয়াহরলাল নেহরুর "দি ডিসকভারী অফ ইণ্ডিয়ার" পাঠকবৃন্দ স্মরণ করতে পারেন, মৃত্যুশয্যা থেকে দেশবাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শেষ বাণী তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) "দৃঢ়তার সঙ্গে অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের উচ্ছেদ সাধন এবং বিরাট মহাদেশ থেকে লাঞ্ছনা ও অপমানের বিলোপ সাধনে" সোভিয়েতের সাফল্যের কথা বলেছেন। তাদের "ত্বরান্বিত ও বিস্ময়কর অগ্রগতি আমাকে খুশীও করেছে এবং সেই সঙ্গে ঈর্ষাপরায়ণও করেছে।" ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন এই ব্যবস্থা "শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।" কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা "সহযোগিতার" উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান লেখকের সামনেই তিনি আমাদের এই বলে সতর্ক করেছিলেন (১৯৪১ সালের জুলাই) যে ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পরও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার অপকৌশল চালিয়ে যাবে। কাজেই তাদের কোনক্রমেই পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলেনা। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকেই তাঁর চিন্তার গভীরতা অনুধাবন করা যায়।

সেদিন যুদ্ধকালীন কঠোর অবস্থার মধ্যেও সারা ভারতের প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হয়। লেখক শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় প্রচুর সমর্থন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সেরা প্রতিনিধি সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলাভ (বম্বে ক্রনিকল) এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকা) অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং সোভিয়েত জীবন ও কৃতিত্ব বিষয়ক নানা

প্রবন্ধ প্রকাশে সাহায্য করেন। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র সংগঠনগুলো এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদরা আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন জানান। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধকালীন চুক্তি বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উপর ভ্রূকুটি হানতে থাকে। তারা রটাতে থাকে যে সমিতি বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির একটা "ফ্রন্ট"। সমিতির কর্মীদের নানা ভাবে বিব্রত করা হতে থাকে। তাঁদের অনেকের গৃহ তল্লাসী করে "প্রগতিশীল" বইপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমনকি কাউকে কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়। কিন্তু সেই পীড়নে ভীরু লোকেরা ছাড়া আর কেউ ভীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সরোজিনী নাইডুর মতো বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির ঘনিষ্ঠ সংযোগই ছিল তার প্রতিনিধি চরিত্রের গ্যারান্টি। জাতীয় নেত্রী শ্রীমতী নাইডু তাঁর কাব্য প্রতিভার জন্য "ভারতের বুলবুল" নামে পরিচিতা ছিলেন।

হিটলারের আক্রমণের কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় একশ' লেখক শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি গরম ইস্তাহার ছাড়া হয়। স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় প্রথম নাম ছিল শ্রদ্ধেয় রসায়নবিদ এবং আজীবন দেশসেবী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। সেই ইস্তাহারে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও সংহতি জ্ঞাপন করা হয়, এবং তার বিরাট কৃতিত্বকে "মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব" বলে বর্ণনা করা হয়। "পরাধীন এবং প্রায় অসহায়" দেশের তরফ থেকে শ্রেষ্ঠতম শুভেচ্ছা জানিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই আশা তাতে ব্যক্ত করা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার উৎপীড়কদের পরাভূত করবেই।

১৯৪১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাঙলা, অন্ধ্র, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও অন্যত্র একের পর এক ছাত্র সম্মেলনে সোভিয়েতের প্রতি সর্বান্তঃকরণ সমর্থনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্প্রতি সোভিয়েত মহাফেজখানায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে ১৯৪১ সালের ২৬শে জুন লণ্ডনস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্র-দূত মেইস্কি সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী

ফারুকীর কাছ থেকে একটি তার পেয়েছিলেন। ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র "দি স্টুডেন্ট" পত্রিকায় ১৯৪১ সালের অগস্ট সংখ্যায় লেখা হয় যে "আমাদের পতাকায় যে বাণী—স্বাধীনতা শান্তি ও প্রগতি লেখা আছে, ফ্যাসিবাদ তার শত্রু"। "বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতা ও প্রগতির দুর্গ এবং মানব জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার যে আহ্বান জানিয়েছেন" তার প্রতি উক্ত পত্রিকায় পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। সারা ভারত কিষাণ সভা এবং অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাও অনুরূপ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সংগঠন কমিটি সভা, শোভাযাত্রা (যেখানে সম্ভব), ঘরোয়া বৈঠক এবং পাঠচক্রের ব্যবস্থা করেন, প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ করেন। এবং চিত্র ও ফিল্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সারা ভারতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপন করা হয়। কিছুকাল বাদে অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর মস্কোর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির ঠিকানা ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট (বর্তমানে অত্যন্ত যথাযথভাবে লেনিন সরণী নামে অভিষিক্ত) তখন শহরের সবচেয়ে সুপরিচিত প্রগতিশীল আড্ডায় পরিণত হয়। কিছুকাল বাদে নানা বিরক্তিকর সমস্যা সত্ত্বেও সেখানে মস্কো থেকে অতি সুন্দর সুন্দর এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বইপত্র, প্রদর্শনীর মাল মশলা (এবং পরে ১৬ ও ৩৫ মিঃ মিঃ ফিল্ম) আসতে আরম্ভ করে। আমাদের কাছে Voks অতি পরিচিত বন্ধু হয়ে উঠল। তার বুলেটিনের (গোড়ায় সাইক্লোস্টাইল করা) জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম। ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিস কিন্তু Voks রাখা রাজ-দ্রোহ বলে মনে করত। কিন্তু তখনকার দিনে পরাধীন ভারতবর্ষে আমাদের শ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমিকরা সুখে দুঃখে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু হতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিলেন। তার পরিণামের কথা তাঁরা চিন্তাও করতেন না।

সোভিয়েত জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রায়শঃ পুস্তিকা প্রকাশ করা হত। ১৯৪১ সালের জুলাই-অগস্ট মাসে কলকাতায় দুটি সংকলন প্রকাশ করা হয়। একটি "দি ল্যাণ্ড অব দি সোভিয়েতস্" (ইংরাজী) এবং অপরটি "সোভিয়েত দেশ" (বাঙলায়)। তার প্রচ্ছদে দিমিত্রি শ্যাপলিমের তৈরী লাল ফৌজের দৃঢ়চেতা এবং গুরুগম্ভীর সংগ্রামী সৈনিকের প্রতিমূর্তির চিত্র মুদ্রিত করা হয়। জওয়াহরলাল নেহরু তখন জেলে ছিলেন। তাঁর কাছে এই সব পুস্তক পাঠানো হতো। পরে তিনি আমাদের বলেছিলেন যে তিনি সেগুলো খুবই পছন্দ করতেন। "ইণ্ডো-সোভিয়েত জার্নাল" নামে একটি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা বের করা হয়। প্রথম তার কয়েকমাস তার সম্পাদক ছিলেন এস-কে-আচার্য। পরে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন বর্তমান লেখক। তিন বছর চলবার পর পত্রিকাটি ১৯৪৪ সালে বোম্বাই চলে যায়। কারণ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সদর দপ্তর শেষে বোম্বাইতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। যে সব চমৎকার চমৎকার সোভিয়েত তথ্যাবলী তখন আমাদের হস্তগত হতো, আমরা সোভিয়েত জনগণের মানসিকতা, লড়াইয়ে জয় পরাজয় সোভিয়েত সভ্যতার দুর্ভেদ্য বনিয়াদ সম্বন্ধে অবহিত হতাম।

গোড়ার দিকে পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশের ব্যাপারে অন্ধ্র, কেরালা, বাঙলা ও পাঞ্জাবের স্থান ছিল সবার উপরে। অতি অল্পকালের মধ্যে তেলুগু ভাষায় এত বেশী সংখ্যক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রগতি লেখক আন্দোলন (১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) সেহ কাগজের পথ প্রশস্ত করে। ঐ সময় প্রগতি লেখক আন্দোলন বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করে এবং সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির মস্ত বন্ধু হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ এবং ভালাথোলের মতো ভারতীয় সাহিত্যের মহানায়কদের আশীর্বাদপুষ্ট প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে তখন সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন সুমিত্রানন্দন পন্থ, যশপাল, মাজাজ, কৃষণচন্দর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্নাভাউ সাঠে প্রমুখ বিরাট বিরাট সাহিত্য-সাধকরা। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী আন্দোলন (যা তখন সুস্পষ্টভাবে "ফ্যাসী-বিরোধী" বলে ঘোষিত হয়েছিল) অবিলম্বেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (Indian Peoples Theatre Association) মধ্যে একটা উদ্দীপ্ত সহায়ক পেয়ে যায় (আই-পি টি এ স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে) গণনাট্য সংঘ তার সকল কাজে সাধারণ মানুষকে পাত্র পাত্রী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেখতে পায় যে যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে সোভিয়েত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অফুরন্ত। তারা মহা উৎসাহে স্বাধীনতা লড়াই এবং সৃজনকর্মে যোগ দিয়ে ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েতের চমকপ্রদ লড়াইয়ের অংশীদার হয়।

* * *

১৯৪১ সালের ৭ অগস্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কলকাতায় তাঁর অবিস্মরণীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অসংখ্য শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যে একটি ছিল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পুষ্পার্ঘ্য। এতে লেখা ছিল, "সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুরা বিশ্বের মহত্তম ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য এবং ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি ও মানব দরদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি অবিচার, শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদের (ভারতবর্ষ যার শিকার) বিরুদ্ধে বারংবার উচ্চকণ্ঠে সতেজ প্রতিবাদ-ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। সোভিয়েত যে সুখ সমৃদ্ধি ও আলোকোজ্জ্বল নতুন বিশ্ব গড়ে তুলছে তার প্রতি তিনি শুভেচ্ছা আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। আমরা গর্বের সঙ্গে সেই স্মৃতিচারণ করছি।" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকেও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পার্টির মুখপত্র "কমিউনিস্ট" নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বে-আইনী ভাবেই তখন প্রকাশ করা হতো। তাতে (খণ্ড ৩, সংখ্যা-৬, অগস্ট ১৯৪১) লেখা হয়, "তিনি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরম সমর্থক হয়ে ওঠেন তখনই আজ ও আগামীকালের দুনিয়ায় আমাদের দেশের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন তার সঠিক পথ খুঁজে পায়। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা

গঠিত সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মত হওয়া তাঁর জীবনের অন্যতম শেষ কীর্তি।" (বাঙলা সাপ্তাহিক "সপ্তাহ" পত্রিকার ১০ই মে-র (১৯৭৪) সংখ্যায় চিন্মোহন সেহানবীশের রচনা দ্রষ্টব্য)

সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা অল্প দিনের মধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হল। লাল ফৌজ যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করছে, বিশ্ববাসীর সমস্ত আশাবাদের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, ৪,৫০০ কিলোমিটার ব্যাপী পূর্ব রণাঙ্গনের ঘটনাবলী শোনবার জন্য যখন দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ রেডিও সেটের দিকে কান পেতে রয়েছে, যখন সোভিয়েতের প্রতিটি জয় স্বাধীনতা ও প্রগতির উদ্দীপনা সৃষ্টি করছে প্রতিটি ব্যর্থতা ফ্যাসিস্ত আতঙ্কের মাত্রা বাড়াচ্ছে, যখন জনমতের চাপে ব্রিটেন ও আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছে, তখন "অবিশ্বাস্য হ্যারী ট্রুম্যান" (পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে ট্রুম্যান বিধানের জনক হয়েছিলেন) এক বহুল প্রচারিত ঘোষণায় বলেন, "যদি আমরা দেখি জার্মানী জিতছে, তাহলে আমাদের উচিত হবে রুশিয়াকে সাহায্য করা। আরও যদি দেখি রুশিয়া জিতছে, তাহলে আমাদের উচিত হবে জার্মানীকে সাহায্য করা। এইভাবে পরস্পর মারামারি করে তারা যত বেশী সংখ্যায় খতম হবে, ততই ভালো।" সৌভাগ্যবশত অসাধারণ বিজ্ঞ লেনিন বহুকাল আগেই সোভিয়েতকে সজাগ করে দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা যে-কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারি। ...সবাই যেন মনে রাখেন যে আমরা যে-সব মানুষ, শ্রেণী এবং গভর্নমেণ্টের দ্বারা পরিবেষ্টিত তারা প্রকাশ্যেই আমাদের প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে।" বিশ্বের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা এই যে সোভিয়েত শক্তির বজ্রদৃঢ় বনিয়াদে কখনও চিড় খায়নি। ঐ সময় নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির "হাউ দি স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড", শলোকভের উপন্যাস এবং যুদ্ধকালীন সোভিয়েত সাহিত্য

ধীরে ধীরে এদেশে আসতে আরম্ভ করে। সেইসব পাঠ করে সোভিয়েতের আলৌকিক সাফল্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সহজ হয়ে ওঠে।

"সব ঝুটা হায়" বলবার মতো নৈরাশ্যবাদী লোকের সংখ্যা এ দেশে তখন কম ছিল না। সাময়িক উন্মত্ততার ঝোঁকে কেউ কেউ এমনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে হিটলারের ব্লিজৎক্রিগের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়ন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ধসে পড়বে। স্বাধীনতার গরবে গরবিণী ফ্রান্স যখন ১২ দিনের মধ্যেই কুপোকাৎ হয়েছে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর কতদিন টিকতে পারে ? হিটলারের বিশ্বজয়ের দিবাস্বপ্নের অনেক কাহিনীই এখন প্রকাশ পাচ্ছে। হিটলার স্থির করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে কয়েক মাসের মধ্যেই খতম করে ইরান, ইরাক ও ভারতবর্ষকে পদানত করবে। তখনকার দিনে হাট বাজারে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের আসরে এসব গালগল্প খুবই শোনা যেতো। কারণ তখনই এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে ব্রিটেন ও আমেরিকা চাইছিল, জার্মানী আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে খতম হয়ে যাক। তাহলে পৃথিবীটা সাম্রাজ্যবাদীদের কবলেই থেকে যাবে। কিন্তু ইতিহাসটা লেখা হচ্ছিল সম্পূর্ণ অন্যভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম চূড়ান্ত সংগ্রাম ছিল মস্কোর লড়াই (১৯৪১)। তার প্রতিটি খুঁটিনাটি এখনও অতি স্পষ্টভাবে স্মরণ করা যায়। গ্রীষ্মকালে কাদা এবং ঠাণ্ডা-বিহীন চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যে বিদ্যুৎগতি ধ্বংসশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধে অসম্ভব অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কাহিনী যে অবিস্মরণীয়। নাৎসী জেনারেলরা তখন প্রায়শঃ বাইনো-কুলারের মধ্য দিয়ে মস্কোর দিকে তাকিয়ে দিন গুণতো, কবে মস্কোয় পৌঁছবে। সমাজতন্ত্রের রাজধানীকে রক্ষা করতে কঠোর ভাবে সুসঙ্কল্পবদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি জাতীর সংগ্রামী যে অতিমানবিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা ভোলবার নয় (প্যানফিলভের কিংবদন্তী ডিভিসনের ২৮ জন সৈনিক ডজন খানেক নাৎসী ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে

বীরবিক্রমে লড়াই করে তাদের ঠেকিয়েছিল। বিনিময়ে দিতে হয়েছিল নিজেদের প্রাণ) তারপরই শুরু হলো পাল্টা-আক্রমণ। ফ্যাশিস্তরা পিছু হঠতে আরম্ভ করল। হিটলার বিরাট সাজসরঞ্জাম সহ চার লক্ষ সৈনিক খুইয়ে পরাজয়ের প্রথম তিক্ত স্বাদ অনুভব করতে পারল। হিন্দী কবি শিউমঙ্গল সিং "সুমন" লালফৌজের উদ্দেশ্যে যে চমৎকার এবং গর্বিত কবিতা লিখেছিলেন, তার লাইনগুলো এখনও মনে পড়ছে : "দশ সপ্তাহ দশ বছরে পৌঁছে যাবে—মস্কো তখনও তুর অস্ত থেকে যাবে।" মস্কোর লড়াই ফতে করার যে 'শর্ট'টা সেদিন (সম্ভবত ১৯৪২ সালের গোড়ায়) আমরা কলকাতায় দেখেছিলাম, তা আজও আমাদের মনের দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। কেড়ে নেওয়া শত্রু-পতাকা, হাজার হাজার চুপসে যাওয়া নাৎসী বন্দী, নাৎসীরা হেঁটে যাবার পর সেই প্রতীকী সড়ক সাফাই—এ সবই আমাদের মনে এখনও সজীব হয়ে আছে। তখনকার দিনে সোভিয়েতবাসীর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একাত্মতা অনুভব করতাম। স্তালিনগ্রাদের লড়াই মহাকাব্য রচনার দিনগুলোয় সেই অনুভূতি আরও বেশি করে উদ্দীপিত হয়। যে তীব্র উদ্বেগাকুল দৃষ্টি নিয়ে বিশ্ববাসী সেদিন স্তালিগ্রাদ যুদ্ধের দিকে তাকিয়েছিল, ইতিহাসে অপর কোনো যুদ্ধে তেমনটা কখনও ঘটেনি। সেদিন ভারতবাসী অধৈর্যভাবে প্রশ্ন তুলেছিলেন : "ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কি হলো? দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে ব্রিটেন এবং আমেরিকার আর কত দিন লাগবে?" সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিও যেখানে সম্ভব এই প্রশ্নে কণ্ঠ মিলিয়েছিল। এই প্রশ্নের পেছনে ছিল সোভিয়েতবাসীর সঙ্গে ভারতবাসীর বিরাট একাত্মবোধের প্রেরণা।

* * *

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালেই সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি বিরাট জনসমর্থন (বিশেষ করে ভারতের বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে) লাভ করে। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পি সি রায়, সি ভি রামন, মেঘনাদ সাহা, হোমী ভাবা, ডি ডি কোশাম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, কে পি চট্টো-

পাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর যামিনী রায় সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ভূমির প্রতি তাঁর সৌহার্দ্য প্রকাশ করতে এগিয়ে আসতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষরযুক্ত বাগ্মীতাপূর্ণ ইস্তাহার ছাড়া হতো। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জওয়াহরলাল নেহরু কলকাতায় ডাঃ বি সি রায়ের (পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন) বাসায় এসে কয়েকদিন ছিলেন। সেই সময় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির এক প্রতিনিধি-দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এই আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করেন। জে সি গুপ্তের মতো কংগ্রেস নেতা এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো অন্যান্য দলের শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতারাও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সভা সম্মেলনে যোগ দিতেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি এক বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘৃণ্য ফ্যাশিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েতের "অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ লড়াই"-য়ের প্রশংসা করেন। শুধু দেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী-রাই সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠেননি, দেশের মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠনও তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৪১ সালের জুলাই অগস্ট মাসে কলকাতায় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পৌরোহিত্য করেন পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঞা ইফতিকারউদ্দীন। (প্রগতিপন্থী হিসাবে খ্যাতিম্যান ইফতিকারউদ্দীন স্বাধীনতার অল্পকাল বাদেই মারা গেছেন এবং তাতে এই উপমহাদেশের মস্ত ক্ষতি হয়েছে।) সম্মেলনে সর্বভারতীয় কিষাণ আন্দোলনের তরুণ নেতা জগজিৎ সিং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বর্তমান লেখক হন যুগ্ম সম্পাদক। "ইণ্ডো-সোভিয়েত জার্নাল" প্রকাশের বিশেষ দায়িত্ব পড়েছিল বর্তমান লেখকের উপর। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন (বিশেষ করে ১৯৪২ সালের ৯ অগস্টের সংগ্রামের পর। এই সংগ্রাম

হয়েছিল গান্ধীজীর "ব্রিটিশ প্রভু ভারত ছাড়" ধ্বনির ভিত্তিতে) কলিকাতায় (কারণ সেই সংগ্রাম দমনের জন্য গভর্নমেণ্ট ভয়াবহ দমননীতি চালিয়েছিল) সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রথম পুরোদস্তর সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে। সেখানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইনিই প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন)। সম্মেলনে অপর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সারোজিনী নাইডু, এন এম জোশী (ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ), এস এ ব্রেলভি, খাজা আহমদ আব্বাস প্রমুখ। সম্মেলনের আগে বেশ কয়েক মাস ধরে অনেক কাজ করতে হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "দি স্টুডেণ্টে"র (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪১) একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ। সেই সংখ্যায় সব রচনার বিষয়বস্তুই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। প্রাক-বিপ্লব যুগে অবহেলিত এবং লাঞ্ছিত রুশ নারী বিপ্লবোত্তরকালে কি ভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সক্রিয় সোভিয়েত নাগরিকে রূপান্তরিত হয়ে নতুন সমাজ গড়ে তুলেছে, সেই কাহিনীই লিখেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। যে হবু-প্রধানমন্ত্রীর জন্য তাঁর মহান পিতা Glimpses of World History লিখেছিলেন, গৌরব উদ্ভাসিত সোভিয়েত ইউনিয়ন যে তাঁর কাছে মোটেই অপরিচিত ছিল না, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

উপরের তথ্যটা আমি সংগ্রহ করেছি "সোভিয়েত ল্যাণ্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত লিওনিদ মিত্রোখিনের একটা রচনা থেকে। অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে ১৯৪৩ সালের ৬ জানুয়ারি সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির শ্রীনগর শাখা কাশ্মীরবাসীর পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। শ্রীনগর শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডি পি ধর। স্বর্গীয় ধর পরে মস্কোয় ভারতীয় দূত নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কিছুকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পরিকল্পনা-মন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। যুদ্ধের সময় ভারত থেকে

প্রেরিত এই রকম অনেক চিঠিপত্র ও বাণী সোভিয়েত মহাফেজখানায় জমা আছে। এই সব চিঠিপত্র মস্কোয় পেঁাছোতো নানা দুর্গম পথে— প্রধানত কাবুলের মাধ্যমে।

২। বোম্বাইয়ে সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে ১৯৪৪ সালের ২১-২৩ এপ্রিল কলকাতায় বিরাট আকারে প্রাদেশিক (বঙ্গীয়) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট প্রভৃতি) প্রতিনিধি সহ দুই শতাধিক বিশিষ্ট নরনারী। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সকল ধরনের বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, মঞ্চ ও চিত্র তারকা, সাংবাদিক আইনজীবী, খেলোয়াড়, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি। তাঁরা যে চমৎকার একটা ইস্তাহার ছেড়েছিলেন, তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের "বিরাট নৈতিক ও বৈষয়িক কৃতিত্বের" উল্লেখ করে সন্তোষের সঙ্গে বলা হয় যে তারা ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে" পৃথিবীতে এক নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে এই সাফল্যের কারণ হলো এই যে, "সোভিয়েত নাগরিক" জানে যে সে তার দেশ এবং দেশের সব কিছুর মালিকানার পূর্ণ অংশীদার এবং তারা ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি পরিপূর্ণ 'কমনওয়েলথ' গঠন করেছে। ব্রিটেনস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মেইস্কি ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তঃমিত্রপক্ষ সম্মেলনে বলেছিলেন, "প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা নির্বাচনের অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়ন অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করে।" উপরোক্ত ইস্তাহারে পুনরুক্তি করে বলা হয় সমস্ত নিপীড়িত জাতির উদ্দেশে সোভিয়েত পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ ১৯৪১ সালের অক্টোবরে যে উদাত্ত আহ্বান জানান ("এমন সময় আসছে যখন মহান নেতা জে বি স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতবাসী নিঃসন্দেহে ইউরোপের মানুষের তথা সমগ্র বিশ্বমানবের মুক্তি সাধন করবে। তাঁরা আমাদের ;) ভালোভাবেই অনুধাবন এবং

অনুমোদন করছেন), তা সত্যিই আনন্দজনক। ইস্তাহারে জাতিবিষয়ক সোভিয়েত নীতির প্রশংসা করে বলা হয় যে শত্রুমিত্র সকলের দ্বারা প্রশংসিত এই নীতি সমগ্র প্রাচ্যের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। তাজিকিস্তান ও জর্জিয়ার তথ্য দিয়ে ইস্তাহারে "সোভিয়েত এশিয়ার" রূপান্তরের কাহিনী বর্ণনা করা হয় এবং সেই রূপান্তরকে "মহাকাব্য" আখ্যা দেওয়া হয়। লেখা হয় "সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ও শিশুর প্রতি যে যত্ন নেওয়া হয়, বিশ্বের অপর কোথাও তা হয় না। সে দেশে সরকারি ব্যয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরীর ক্ষেত্রে যে বিরাট গবেষণা যজ্ঞ চলছে, তেমনটা পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। পুস্তক প্রকাশনার সংখ্যায় সোভিয়েত আর সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে এবং সে দেশে মানবিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এত মানুষের নাগালের মধ্যে যা অন্যত্র অসম্ভব।" ইস্তাহারে সন্তোষের সঙ্গে বলা হয় যে বিশ্বের সবচেয়ে বিধ্বংসী ও ভয়াবহ যুদ্ধও সোভিয়েতের সৃষ্টিশীল শ্রম স্তব্ধ করতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নে মহান বহুজাতিক ঐক্য এমনই দৃঢ়বদ্ধ যে সাইবেরিয় এবং তাজিকরা স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং কাজাক গার্ডস্‌মেনরা তাদের নিজস্ব "সোভিয়েত মস্কো" রক্ষায় অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করে অমরতা অর্জন করেছে। ইস্তাহারে বন্ধুত্ব ও সংহতির আন্তরিক প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। এই দলিলটি সত্যিই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। সেই দুঃসময়ে অসাধারণ প্রতিনিধিত্বমূলক এই প্রতিবেদনে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর যে আন্তরিক আবেগ প্রতিফলিত হয়, তা সত্যিই অনন্য।

• যুদ্ধের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্যায়ে সোভিয়েত অসাধ্যসাধন করেছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত অসাধ্য সাধন করেছিল তার চিত্তের দৃঢ়তায়, তার সংগঠনে, তার সংসক্তিতে এবং পিতৃভূমির প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্য ও নিষ্ঠায়। লেনিনের নগরী এক হাজার দিন নির্মম অবরোধের মধ্যে কাটিয়ে কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে

বেরিয়ে এল—এ ঘটনা সুদূর ভারতবাসীর কাছেও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। স্ত্যালিনগ্রাদের কাহিনী—এক মহান মানবিক শৌর্যের কাহিনী। এ কি কেউ ভুলতে পারে ?

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে ভারতের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের (১৯৪২ সালের অগস্ট মাসে) মধ্যে। তাতে ব্রিটেনের উপর ভারত ত্যাগের নোটিশ জারী করা হয়েছিল বটে তবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রিটেনের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও সেই প্রস্তাবে বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছিল যে রুশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা "বিব্রত" করা উচিত নয়। কারণ "তার স্বাধীনতা অতিশয় মূল্যবান এবং সেটা রক্ষা করা দরকার।" ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নায়ক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু। বেয়াল্লিশের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ-ও এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে নেতাজীর মতামত (যা যুদ্ধের মেঘাবৃত দিনগুলোয় অদ্ভুত ভাবে বিকৃত করা হয়েছিল) নিয়ে শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে বর্তমান লেখকের যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল, তা এখনও মনে আছে। তিনি পরিষ্কারভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বের (কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদ থাকলেও) কথা প্রকাশ করেছিলেন।

* * *

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির একটি প্রতিনিধিদলের আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার কথা হয়েছিল এবং হুসেন জাহির (পরে ডাইরেক্টর জেনারেল, কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ), এস-কে আচার্য (পরে পশ্চিমবঙ্গের এডভোকেট জেনারেল এবং গণতান্ত্রিক আইনজীবী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা) এবং বর্তমান লেখককে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। বিশিষ্ট কিষাণ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বঙ্কিম

মুখার্জীরও মস্কো যাওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু অনতিক্রম্য বাধার ফলে সেই আইডিয়া বাতিল করা হয়। ১৯৪৩ সালে মেঘনাদ সাহা মস্কোয় বিজ্ঞান বিষয়ক এক সম্মেলনে যোগ দিতে পেরেছিলেন। ফিরে এসে তিনি সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির এক সভায় অতি চমৎকার এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠ করেন এবং সেটা পরে "ইণ্ডো-সোভিয়েত জার্নালে" ছাপা হয়।

বড়ই পরিতাপের কথা "ইণ্ডো-সোভিয়েত জার্নালের" কোন কপি এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটা ছাপা হতো বোম্বাইতে। তার কিছু কপি হয়ত কারও কাছে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ১৯৪১ সাল থেকে পরপর তিন বছর কলকাতার যে পাক্ষিক পত্রিকাটি ছাপা হয়েছিল, তার কোন কপি পাওয়া যায় না। পত্রিকার এবং সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সাধারণ কাজ করবার সময় আমরা যতদূর সম্ভব সোভিয়েত তথ্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতাম। যুদ্ধের সময় সোভিয়েতের সঙ্গে মিত্রতা থাকায় ঐ সব তথ্য এদেশে আসতে শুরু করে। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কাছে সোভিয়েত থেকে আসত নানা রকমের পত্র-পত্রিকা ফিল্ম, প্রদর্শনীর মালমসলা ইত্যাদি। ঐ সময় "ওয়ার অ্যাণ্ড ওয়াকিং ক্লাস" (পরে "নিউ টাইম্স্" নামে পরিচিত), "মস্কো নিউজ" ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রও আসতে আরম্ভ করে। ঐ সময় আমরা সিমোনভ এবং এরেনবুর্গের অসাধারণ রিপোর্টিং-এ রণাঙ্গনের স্বাদ পাই। এরেনবুর্গ ভারতীয় পাঠকের কাছে খুবই সমাদর লাভ করেন। যুদ্ধের পর তিনি ভারত পরিদর্শনে এলে তাঁকে বিরাট অভ্যর্থনা জানানো হয়। শিশু জয়া নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করে জ্যোতির্ময়ী নায়িকায় পরিণত হয়। ভারতবাসী স্নেহ এবং গর্বের সঙ্গেই তাকে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে ভারতে অনেক নবজাতকেরই নাম রাখা হয় জয়া। নাৎসী উৎপীড়নের কথা শুনে আমাদের গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠত। বর্তমান লেখকের বেশ মনে

আছে, এরেনবুর্গ লিখেছিলেন "সোভিয়েত হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।" তাঁর সেই অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "না"—নোংরা দস্যুদের প্রতি। এরেনবুর্গের এই ধরনের ন্যায্য প্রতিশোধস্পৃহা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সংশোধন করে দেন। কারণ সোভিয়েত নেতৃত্ব জাতিগত আত্মম্ভরিতার বিন্দুমাত্র ছায়াও বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। এই সব কথা মনে পড়লেই ইওরোপে লাল ফৌজের মুক্তি মিশনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। জার্মানীর দস্যু ফ্যাশিস্ত সরকার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল। সমগ্র জনগণের চিন্তাধারা বিকৃত করেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিষ্ঠুরতম অগ্নিপরীক্ষায় টেনে এনেছিল। কিন্তু তবু লাল ফৌজের মনে কোন প্রতিহিংসার প্রেরণা জাগেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল জার্মানীকে ফ্যাশিস্তদের হাত থেকে মুক্ত করা মাত্র।

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কলকাতা এবং বোম্বাই এবং অন্যান্য স্থানের অফিসে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন মিত্র পক্ষের সৈনিকরা। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কলকাতা অফিসের সঙ্কেত নাম হয়ে গিয়েছিল নং ৪৬। সেখানে ভারতীয়দের সঙ্গে ব্রিটিশ, মার্কিন (শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো এবং জাপ মার্কিন সহ), ফরাসী, পোলিশ এবং গ্রীক সোভিয়েত-সুহৃদরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রায়ই ইণ্টারন্যাশনেল (১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সোভিয়েতের জাতীয় সঙ্গীত) অথবা "সোভিয়েত ভূমি বিশ্ব শ্রমিক প্রিয়" গান গাইতেন। গান দুটি বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন মোহিত ব্যানার্জি। বহু নিষ্ঠাবান আত্মত্যাগী কর্মী তখন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পতাকাতলে এসে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের নাম করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে যে দুই একজনের নাম না করলেই নয়, তাঁদের মধ্যে কলকাতায় ছিলেন খ্যাতিমান স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরণী গোস্বামী (মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী), বিখ্যাত ফুটবল 'তারকা' বীরেন ঘোষ এবং মহা উৎসাহী তরুণ

কর্মী দিলীপ বোস। বোম্বাইতে ছিলেন জাম্বেকাররা, শিরালী, হেজ এবং বাখিয়ারা। সর্বভারতীয় সম্মেলনের (১৯৪৪) পর আর-এম জাম্বেকার সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সাধারণ সম্পাদকও "ইণ্ডো সোভি-য়েত জার্নালের" সম্পাদক হন। তিনি পঞ্চম দশকের সূচনা পর্যন্ত সক্রিয় ভাবে এই আন্দোলনের সেবা করেন। কিন্তু সেই সময় নানা কারণে সাময়িক ভাবে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির অফিসে এবং সভা সমিতিতে সব সময়ই একটা বিশ্বভ্রাতৃত্বের গৌরবময় অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যেতো। কারণ এই আন্দোলন তখন এমন একটি চমৎকার মঞ্চে পরিণত হয়েছিল যে সেখানে এলে নিজের অজ্ঞাতেই সবাই বিশ্বমানবের মৌলিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের স্বাদ পাওয়া যেতো। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চারী যে অসংখ্য কবিতা, সঙ্গীত, গাথা এবং নাটক সৃষ্টি হয়েছিল, তা সামাজিক পরিবর্তন সাধনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। মহারাষ্ট্রে নিপীড়িত (হরিজন) মানুষের পক্ষে লেখক-সংগ্রামী আন্নাভাউ সাঠে স্তালিনগ্রাদের উপর এক বিখ্যাত গাথা রচনা করেন। মারাঠা পাউয়াড়া (লোক সঙ্গীত) যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে। প্রগতিশীল লেখক ও গণনাট্য আন্দোলন লাল পতাকাকেই তাদের পতাকা হিসাবে গ্রহণ করে। এমনকি যারা কখনও কমিউনিজমকে গ্রহণ করেনি, তারাও যুদ্ধের সেই দিনগুলোয় সোভিয়েতের গৌরবকে স্বাগত জানায়। যুদ্ধরত সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবের আলোক বর্তিকা থেকে প্রেরণা লাভ করত সঙ্গীত কবিতা এবং নাটক। আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, খাজা আহমেদ আব্বাস, রবিশঙ্কর, অমর শেখ, বলরাজ সাহানী, শম্ভু মিত্র, শান্তি বর্ধন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, এবং বিজন ভট্টাচার্যের (নবজীবনের গান ও নবান্ন খ্যাত) মতো প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী। দেবব্রত বিশ্বাস এবং হেমন্ত মুখার্জীও ছিলেন এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি থেকে

আই পি টি এ—সোভিয়েত জনগণের মহান দেশাত্মবোধক যুদ্ধের ঢেউ ভারতীয় জনগণের মধ্যে এক নতুন তরঙ্গের সূচনা করে।

* * *

সোভিয়েত নাগরিকের প্রথম ভারত পরিদর্শন উপলক্ষে যে উল্লাসের সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করা যায়। সম্ভবত প্রাভদার সংবাদদাতা হিসাবে গ্লাদিশেভ প্রথম ভারতে আসেন এবং সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির দ্বারা সম্বর্ধিত হন। সেই সম্বর্ধনা সভায় গৃহীত একটি গ্রুপ ফোটোগ্রাফে তরুণ আইনজীবী এ এন রায়ের সাক্ষাৎ মেলে। ইনিই এখন ভারতের প্রধান বিচারপতি। বিশিষ্ট সংস্কৃতি সাধক এরেনবুর্গ ও মির্জো তুরসুন-জাদে এবং বিখ্যাত ফিল্ম প্রযোজক পুদভকিন ও চেরকাসভও পরে ভারতে এসেছিলেন এবং সানন্দ সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার ও দূতাবাস বিনিময় হবার আগেই সম্ভবত ১৯৪৩ সালে কলকাতায় সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধির অফিস খোলা হয়েছিল। পরে সেটা কমার্শিয়াল কাউন্সেলরের অফিসে উন্নীত হয়। সেই সময় বোম্বাইতে সোভিয়েত ফিল্ম পরিবেশন সংস্থাও গঠিত হয়েছিল। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যখন চমৎকার চমৎকার ছবি আসতে থাকে তখন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি সানন্দে তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের আরও সুযোগ পায়। সে ব্যাপারে সমিতি তরুণ প্রতিভা সত্যজিৎ রায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তা লাভ করে। এই সত্যজিৎ রায়ই পরে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক হিসাবে মস্কো এবং ফিল্ম রসের গুণগ্রাহী বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত হয়েছেন। আইজেনস্টাইনের সর্বকালের ধ্রুপদী ফিল্ম "ব্যাটলশীপ পোটেমকিন" যুদ্ধচিত্র সুভোরভ থেকে "ব্যাটল্ অফ বার্লিন" পর্যন্ত সবই ছিল চমৎকার। দনস্কোইয়ের "চাইল্ডহুড অফ ম্যাক্সিম গোর্কী" দেখে সকলেই খুব উপভোগ করেছেন। তার আগে মাকারেঙ্কোর "রোড টু লাইফ"-এর চিত্ররূপ আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছিল। সমাজের নিম্নতম স্তরে নিমজ্জিত, ঘর-ছাড়া

শিশুরা বুর্জোয়া সমাজে সম্পূর্ণভাবে অনাদৃত। কেউ তাদের কথা চিন্তা করে না। কিন্তু তাদের যে পুনরুজ্জীবিত করে আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন নাগরিকে রূপান্তরিত করা যায় সেটা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। সেই নবজীবনের প্রেরণা হচ্ছে বিপ্লবের রূপান্তরী শক্তি এবং শিক্ষা। সোভিয়েত ছবির (১৬ এবং ৩৫ মিলিমিটারের) ছোটখাট প্রাইভেট শো ছাড়াও কমার্শিয়াল শো-ও ঐ সময় শুরু হয় এবং বিশেষ জনপ্রিয়তাও লাভ করে।

[illegible]ন্তর পর প্রাভদার সংবাদদাতা হয়ে আসেন ওলেগ ওরেস্তভ। তনি বাঙলা জানতেন। স্বভাবতই কলকাতায় তাঁর বহু বন্ধু জুটে যায়। ভারতের সৃষ্টিশীল সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বে যথেষ্ট অবদান রাখে। স্বাধীনতার পর দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর হয়ে ওঠে। কমার্শিয়াল কাউন্সেলর অঁাদ্রায়েঙ্কোর বাসভবনটা প্রকৃত "সুহৃদ ক্লাবে" পরিণত হয়। মাদাম এরজিনার (এন্তোনিনা কোরোৎস্কায়া) কথা সানন্দেই স্মরণ করা যায়। ১৯৪৭ সালের পর প্রথম বছরগুলোয় তিনি ছিলেন সোভিয়েত দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে। তিনি আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন। তার ফলে মাঝে মাঝে তিনি অনেক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তেন। ১৯৪৮ সালের গোড়ায় তিনি এক ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সমাবেশ প্রতিক্রিয়াশীল গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তিনি অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন এবং যে-কোন জিনিসই অতিসহজে অনুধাবন করতে পারতেন। খুবই আনন্দের কথা এই যে ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা, বিশেষ করে ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁর রচনা (রুশভাষায়) কয়েক বছর আগে তাঁকে নেহরু পুরস্কারের অধিকারিণী করেছে। মিষ্টি স্বভাবের তরুণ সোভিয়েত অফিসার চুমাশেঙ্কোর কথা নিশ্চয়ই অনেকেরই মনে পড়বে। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় এক পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীতে সোভিয়েতের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

আলোচনা করতে এসেছিলেন। সেই সময় বাঙালী সাংবাদিক অমল হোম তাঁকে বলেন, "আপনার নামটা খুবই অর্থবহ। প্রথমাংশের 'চুমা' হচ্ছে বাঙলার মধুরতম শব্দ। দ্বিতীয়াংশের "মোস্কো"র অর্থ বিষ (সেঁকো)"। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল "হ্যাঁ মিঃ হোম লোকে বলে, আমার দেশের চুমায় নাকি বিষ আছে।"

আগের অংশ পড়ে পাঠকের মনে যদি এই ধারণা হয় যে দেশে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর পথটা বরাবরই খুব মসৃণ ও প্রশস্ত ছিল তাহলে সেটা ভুল হবে। শত্রুর অপপ্রচারের নখদন্ত সবসময়ই উদ্যত ছিল। বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যুদ্ধের দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার বিপর্যয়কর দিনগুলোয় সোভিয়েতের গৌরব যখন আকাশের তারকার মতো জাজ্বল্যমান ছিল, তখন সেই নখ এবং দাঁতের বিষ কথঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছিল মাত্র। মাঝে মাঝে সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা-কাহিনী বাজারে ছাড়া হতো। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগও তোলা হতো। কিন্তু সব তথ্য আমাদের জানা ছিল না বলে, আমরা সক্রিয়ভাবে তার জবাব দিতে পারতাম না। সমাজের শক্তিশালী অংশের মধ্যে বহু কুসংস্কারের শিকড় গেড়ে বসেছিল এবং এখনও আছে। সেগুলো উৎপাটন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কালক্রমে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ইতিহাসে সোভিয়েতের ভূমিকা মূলত এত আলোকসঞ্চারী যে ভারতের মতো দেশ সত্যিই তাকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারে। এই বন্ধুত্বের পথ থেকে কখনও কখনও বিচ্যুতি ঘটতে পারে কিন্তু আমাদের পরিস্থিতিতে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই স্বাভাবিক। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি হিসাবে জওয়াহরলাল নেহরু যখন অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেণ্টের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হন, তখন তিনি অতি সতর্কভাবে একটি নীতি-নির্দেশক বিবৃতিতে ভারতের ইচ্ছার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, "ভারত পরস্পরের বিরুদ্ধে সমবেত গোষ্ঠীগুলোর ক্ষমতার লড়াইয়ের বাইরে থাকতে চায়।" তাতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে "অভিনন্দন"

জানিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের এই এশীয় পড়শীর সঙ্গে একযোগে অনিবার্যভাবে অনেক সাধারণ তথ্য সম্পাদন করতে হবে এবং সেখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক কিছু করবার আছে।

যুদ্ধের মধ্যে কোন এক সময় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি এই অভি-যোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, সোভিয়েত যখন ব্রিটেনের মিত্র, তখন সেভিয়েতের পক্ষে ভারতের উপর ব্রিটেনের বজ্রমুষ্ঠি শিথিল করার কথা বলা সম্ভব হবে না। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সোভি-য়েতের কোন সহায়তা পাবেনা। তখনকার দিনে যতটুকু যা তথ্য আমাদের জানা ছিল, তাই দিয়ে আমরা এই অভিযোগের জবাব দিতাম কিন্তু মূলত আমরা যে তখন ঠিক কথাই বলেছিলাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তখন আমরা বলতাম, অধীনস্থ প্রজাদের স্বাধীনতা দানের জন্য শাসক শ্রেণীর কাছে উদার হবার আবেদন খুবই অবাস্তব এবং মর্মান্তিক প্রস্তাব। সেটা আত্মসম্মানবোধের কলঙ্কও বটে। সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে কোনো ত্যাগের আশা করা মার্কসবাদী শিক্ষার পরিপন্থী। কাজেই সোভিয়েত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উদার হবার আহ্বান জানাবে এটা আশা করাই ভুল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে (বিশেষ করে এশিয়ায়) সোভিয়েত সমর্থনের সমুজ্জ্বল ইতিহাসের যতটুকু আমাদের জানা ছিল, তাই দিয়ে আমরা আমাদের যুক্তি খাড়া করতাম। লেনিন যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের নীতি রচনা করে গেছেন, তাও আমরা উল্লেখ করতাম। উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতাম, ১৯২৪ সালে স্তালিন তাঁর "লেনিনবাদের বনিয়াদ"-এ এই আশা ব্যক্ত করেন যে, ভারতবর্ষ শীঘ্রই তার বিপ্লব সাধন করে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের পরবর্তী বিরাট যোগসূত্রটি ভেঙে দেবে। আমরা তখন নিজের দেশে সোভিয়েতের জাতি সংক্রান্ত নীতির উল্লেখ করতাম এবং পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েত যে বিশ্বের স্বাধীনতা ও প্রগতির নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অনুসরণ করছে, তাও ব্যাখ্যা করতাম। সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটভ সানফ্রানসিস্কোয়

রাষ্ট্রসংঘের উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন (১৯৪৬ সালের মে মাসে) তাও আমরা তুলে ধরতাম। মলোটভ বলেছিলেন, "এমন এক সময় আসছে যখন স্বাধীন ভারতের কণ্ঠস্বরও শোনা যাবে।"

এই কথাগুলি এখন বিশেষভাবে বলা হচ্ছে এই কারণে যে বর্তমান লেখক শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কাছ থেকে জানতে পারেন যে সেই সময় মলোটভের বক্তৃতা তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সানফ্রানসিস্কোর সেই সভায় ভারত থেকে ব্রিটিশ-নিযুক্ত একটি অধঃস্তন প্রতিনিধি দল যোগ দিয়েছিল। কংগ্রেস থেকে পাঠানো হয়েছিল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে। স্বাধীন ভারতের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই দেখে মলোটভ যখন দুঃখ প্রকাশ করেন এবং খুব সংযত ভাষায় বলেন যে ভারত অবিলম্বেই স্বাধীন হবে, তখন সোভিয়েতের প্রতি ভ্রাতা জওয়াহরলালের মতো আবেগপ্রবণ না হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। সত্যিকারের এক বৃহৎ শক্তির সরকারি প্রতিনিধি নতুন বিশ্বসভায় ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলছেন দেখে শ্রীমতী পণ্ডিত অভিভূত হয়ে পড়েন।

সাত

নয়াদিল্লিতে এশীয় সম্পর্ক সম্মেলনের (১৯৪৬ সালের মার্চ-এপ্রিল) উদ্বোধনী ভাষণে জওয়াহরলাল নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়নের আটটি প্রজাতন্ত্র থেকে আগত ১৪ জন প্রতিনিধিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, "এই পুরুষে এশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির অগ্রগতি এত দ্রুত হয়েছে যে তার থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে।" ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে (১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে) সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন এবং সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতা আচার্য ভোলগিন "ইজভেস্তিয়া" পত্রিকায় লেখেন (১৯৪৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি), "ভারতে যাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনিই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং সোভিয়েত সংস্কৃতির প্রতিনিধিদের দেখে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন। (১৯৭৪ সালে দিল্লিতে প্রকাশিত "Soviet Relations with India and Pakistan" গ্রন্থের ২৯ পাতায় উদ্ধৃত।)

ভারতের স্বাধীনতার প্রায় এক বছর আগে নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। সেই কাজ সুসম্পন্ন হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ৪ মাস আগে (১৯৪৭ সালের ১৩ এপ্রিল)। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সারা ভারত সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৩ অগস্ট তিনি ক্রেমলিনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে পরিচয়পত্র পেশ করেন এবং সেই অনুষ্ঠানে তিনি দুই

দেশের মধ্যে "বিশেষ যোগসূত্রের" উল্লেখ করেন। ভারতে নিযুক্ত প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত কে ভি নোভিকভ কিছুকাল বাদেই আসেন নয়াদিল্লিতে। ১৯৪৭ সালের ১৪ মার্চ জওয়াহরলাল নেহরু কেন্দ্রীয় আইনসভায় বলেন যে সোভিয়েত পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ কি ভাবে সম্পন্ন হয়, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তিনি যতশীঘ্র সম্ভব সে দেশে একটি অর্থনৈতিক মিশন প্রেরণ করতে ইচ্ছুক। ইংরাজরা ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগেই (১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট) ভারত-সোভিয়েত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকে স্বাগত জানিয়ে সোভিয়েত সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউ টাইম্স্ (১৯৪৭ সালের ১৮ এপ্রিল) বলে যে এটা একটা "আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা" এবং "দুই দেশের মানুষ পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব পোষণ করেন, এটা তারই নিদর্শন। ভারত যে স্বাধীন নীতি অবলম্বনের পথে অগ্রসর হচ্ছে, এটা তারও একটা লক্ষণ।

কে পি এস মেনন দীর্ঘকাল মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির (ISCUS) প্রেসিডেণ্ট। তিনি বলেছেন স্বাধীনতার পর ভারত সোভিয়েত সম্পর্ক সামান্য কিছুকালের জন্য নিরুত্তাপ ছিল। ১৯৫৫ সালের পর থেকে শুরু হয় সক্রিয় এবং ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের পর্যায়। তার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিতরের খবর সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল মেনন একবার লিখেছিলেন যে স্বাধীনতার ঠিক পরেই "ইংরাজ শাসনের কুপ্রভাবের ফলে কিছু ভারতীয় এই ভয়ে ভীত ছিলেন যে রুশরা যেন-তেন-প্রকারেণ দুনিয়াটাকে লাল বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আবার কিছু রুশের ধারণা ছিল, ভারত নামে স্বাধীন হলেও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রের সঙ্গে আগাপাশতলা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।" (তার "লেনিন থ্রু ইণ্ডিয়ান আইজ" গ্রন্থের ৬৭-৬৮পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থটি ১৯৭০ সালে দিল্লিতে প্রকাশিত হয়)। ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের এতবড় একজন বন্ধুর মুখ থেকে উচ্চারিত এই কথাগুলি ভেবে দেখবার মতো।

এই পরিস্থিতির সারমর্ম অনুধাবনের জন্য ইতিহাসের কয়েকটি বিষয় এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। এদেশে যে-ভাবে স্বাধীনতা এসেছে তাতে স্বাধীনতা কিছুটা কলুষিত হয়েছে। এদেশে গণসংগ্রামের প্রত্যক্ষ এবং গৌরবময় বিজয়ের পরিণত হিসাবে স্বাধীনতা আসেনি। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত একটি আইনের মাধ্যমে ইংরাজদের ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে এসেছে এই স্বাধীনতা। সাম্রাজ্যবাদ তার বিনিময়ে কঠোর মূল্য আদায় করে নিয়েছে দেশটা দুই ভাগ (ভারত-পাকিস্তান) করে। মতলববাজী করেই তারা এই কুকার্যটি সম্পন্ন করে। ইংরাজরা বরাবরই এদেশে বিভেদ প্ররোচিত করে দেশটাকে শুষে খেয়েছে। বিদায়কালে এটা তাদের শেষ পদাঘাত। তাতে আমাদের যে ক্ষয় ক্ষতি দুঃখ বেদনা সহ্য করতে হয়েছে, তা যে কোনো বিপ্লবের "মূল্যের" চেয়ে অনেক বেশী। দেশ বিভাগের (ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন) দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ এই উপমহাদেশে যেন একটি টাইম বোমা পেতে রেখে যায়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করে তাদের সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল করে রাখাই ছিল তার উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টধর্মের "আদিম পাপের" মতো এটা তদবধি নানাভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐক্যবদ্ধ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা করে যাচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের দন্তোদ্‌গম কালটাও খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে তার মেট্রোপলিটান অর্থনীতির কৃষি পশ্চাদভূমি বানিয়ে রেখেছিল। এই পরিকল্পিত পশ্চাদপদতা ভারতকে জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় এবং তার সমাধান ত্বরান্বিত করা সহজ কাজ ছিল না। দেশবিভাগের ফলে প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেশের দুঃখ দুর্দশা সাংঘাতিক বাড়িয়ে দেয়। ছোট বড় কয়েকশ "দেশীয় রাজ্য" দাবার ছকের মতো ভারতের মানচিত্রটিকে বহুবর্ণ রঞ্জিত করে রেখেছিল এবং ব্রিটিশ "প্রভুর" অন্তর্ধানের পর অনেক "নৃপতিই" সার্বভৌমত্ব অর্জনের দিবাস্বপ্ন দেখছিল। তাদের

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের আওতায় আনার কাজটা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ইংরাজদের রেখে যাওয়া আমলাতন্ত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে সাধারণভাবে কায়েমী স্বার্থের যোগসাজসে "স্থিতাবস্থার আবহাওয়া" বজায় রাখবার চেষ্টা করছিল, যদিও সেটা ছিল সদ্য-স্বাধীন দেশের মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ১৯৪৫-৪৬ সালে অসংখ্য সভা সমিতিতে জনগণের হৃদয়ে আলোকবর্তিকা জ্বালবার সঙ্কল্প ঘোষণা করা সত্ত্বেও জওয়াহরলাল নেহরুর মতো বিশ্বের সবচেয়ে সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষও জন-মানসে তেমন কোনো উৎসাহ সঞ্চার করতে সক্ষম হননি।

সোভিয়েত ইউনিয়নও যে বিরাট যুদ্ধোত্তর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে যখন সে হাত লাগিয়েছে ঠিক সেই সময় পশ্চিমী শক্তিবর্গ "ঠাণ্ডা লড়াই" শুরু করে তার নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছিল। সেই সব নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এত বেশী ব্যস্ত ছিল যে ভারতের মতো সদ্য-স্বাধীন দেশের বিশেষ সমস্যাদি নিয়ে এবং ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর আকারে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে তোলার প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো বোধহয় তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোনো দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তিই ভুলতে পারেন না যে হিরোশিমা ও নাগাসাকির পর কিছুকাল পশ্চিমের পারমাণবিক মনোপলির ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের এবং পূর্ব-ইউরোপের নবীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির (এবং ১৯৪৯ সালের চীনের) সমাধানের কাজে ব্রতী হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে শক্তি গড়ে তোলে তাতে সে একাই "ঠাণ্ডা" লড়ুয়েদের (যারা প্রায়শ গরম হয়ে ওঠে) উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম। বিদেশী পুঁজির উপর তখনও ভারতের একান্ত নির্ভরশীলতা, ব্রিটেনের সঙ্গে তার বন্ধন এবং তার ঘোষিত "গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা নীতি"র "পশ্চিমীমুখীনতা" এবং কোরীয় যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলবার পর পর্যন্ত অন্তত তার অস্পষ্টতা দেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি অসুখী হয়ে থাকে, তাতে ভারতবর্ষের কেউ বিস্মিত হতে পারেন কি?

ইতিহাসের পথটা আকাবাঁকা। বিশ্ব কমিউনিজমের কোনো কোনো যুদ্ধোত্তর প্রবণতা দেখে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৮-৫১ সালে যে নীতি ও কার্যসূচী অনুসরণ করে সেই নীতি সঙ্কীর্ণতাবাদী বলে পরে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টি আবার গভর্নমেণ্ট কর্তৃক বে-আইনী (পাঁচ বছর যাবৎ আইনসঙ্গত অস্তিত্ব বজায় রাখবার পর) ঘোষিত হয়। শাসকশ্রেণীর ক্রোধ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির মতো সংগঠনের উপরও পতিত হয়। তার অফিস তছনছ করা হয়, সক্রিয় কর্মীরা অনেকেই হয়রানির সম্মুখীন হন এবং জেলে আটক থাকেন এবং সংগঠনের কাগজপত্র গভর্নমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করে এবং নষ্ট করে ফেলে। প্রধানত সেই কারণেই "ইণ্ডো-সোভিয়েত জার্ণালের" কপিগুলি অমিল হয়ে গেছে। বর্তমান লেখক সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ও সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের বহু সহকর্মীর সঙ্গে জেলে প্রেরিত হন এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে বিনা বিচারে জেলে আটক থাকেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোভিয়েত চলচ্চিত্র দেখানোও নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্র সম্মেলনে এবং প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের আগমন বন্ধ করে দেওয়া হয়। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি তখনও মাথা তুলে খাড়া হয়ে থাকে কিন্তু তাকে ঘিরে রাখে কালো মেঘ এবং আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। চিত্রটা একেবারে অনুজ্জ্বল ছিল—এমন মনে করার কোনো হেতু অবশ্য নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫১ সালে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং চা পাট ও তামাকের বদলে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করে। খাদ্য বোঝাই সোভিয়েত জাহাজ মাদ্রাজ ও কলকাতা বন্দরে এসে পৌঁছলে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি তাদের স্বাগত জানাবার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে বোম্বাইতে একটি সোভিয়েত শিল্প প্রদর্শনী হয়। সেখানে সোভিয়েত চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান নেস্তেরভ ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন।

এই ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-৫১ সালের শীতকালে সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে পুদভকিন চেরকাসভ প্রমুখ ব্যক্তিরা কলকাতা, বোম্বাই ও অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন করেন। তাতে ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব নতুন উদ্দীপনা লাভ করে। ১৯৫২ সালের এপ্রিল-মে মাসে মস্কোয় যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অপর ৪২টি দেশের সঙ্গে ভারতও যোগ দেয়। নেস্তেরভ "ভারতীয় টাকায়" বাণিজ্যিক লেন-দেনের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে (১৯৫২) ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থাবিশিষ্ট দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিকাশের আহ্বান করা সত্ত্বেও ১৯৫৩ সালে ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় এক কোটি টাকার সামান্য বেশী।

বন্ধুত্বের আবহাওয়া কলুষিত করার চেষ্টাও কিছু কম হয়নি। মতলব-বাজ লোকেরা কুৎসামূলক অপপ্রচার চালিয়ে উল্টো বোঝাবার চেষ্টাও করেছে। যেমন ধরুন, হঠাৎ অভিযোগ উঠল গান্ধী সম্বন্ধে সোভিয়েত মূল্যায়ন নেতিবাচক এবং সেটাই নাকি এই দেশ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের বিরূপ মনোভাবের প্রমাণ। সব ঘটনা পুরোপুরি জানা না থাকার ফলে এই অপপ্রচারের জবাব দেওয়া তখন সম্ভব হয়নি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, গান্ধীজীর অনেক চিন্তা ও কর্ম নেহরুর কাছেই "হেঁয়ালী" ছিল। গোড়ায় গান্ধীবাদ সম্পর্কে ভারতীয় কমিউনিস্টদের মূল্যায়নও যে সমালোচনামূলক ছিল, তাও সত্যি। তবে তার কারণও সহজবোধ্য। কিন্তু গান্ধীবাদের খামখেয়ালী চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন লেনিন মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকায় তার ইতিবাচক মূল্যায়নই করে-ছিলেন। দিয়াকভ থেকে উলিয়ানভস্কি পর্যন্ত সকলেই গান্ধীজী সম্পর্কে নীতিসম্মত মূল্যায়নই করেছেন। এই মূল্যায়নে গান্ধীবাদের সমালোচনা করা হলেও গান্ধীজীর প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়নি। গান্ধীবাদের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে সেই ভাবেই তার সমালোচনা করা হয়েছে। সেই হিসাবে এই মূল্যায়ন বিশেষ গুরুত্ব-

পূর্ণ। স্বাধীনতার পরবর্তী কঠিন দিনগুলোয় ভারত সম্পর্কে সোভিয়েত মনোভাবের নানা বিকৃত ব্যাখ্যা চলতে থাকে কিন্তু সেগুলোর জবাব দেওয়া খুব সহজ ছিল না। কিন্তু পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের ব্যাপক উন্নতি ঘটায় আজ অবস্থাটা একেবারেই পাল্টে গেছে।

এখানে এটা স্মরণ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ১৯৫১ সালে Voks-এর আমন্ত্রণে একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদল সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। বর্তমান লেখকও আমন্ত্রণ লাভ করেছিলেন কিন্তু সম্ভবত তিনি কমিউনিস্ট হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন বলে তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি। আজ একথা মনে পড়লে হাসি পায় যে স্বাধীন ভারতের প্রথম পার্লামেণ্টে (১৯৫২ সালের মে মাসে যার প্রথম অধিবেশন হয়) কমিউনিস্ট সদস্য হিসাবে বর্তমান লেখক একটি আসনের অধিকারী হয়েছিলেন। তখন তিনি অর্থমন্ত্রী দেশমুখ এবং টি-টি কৃষ্ণমাচারীকে বলতে শুনেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্ভব নয় কারণ দুই দেশের বাণিজ্য পদ্ধতিই আলাদা। ১৯৫২ সালের শেষে অথবা ১৯৫৩ সালের গোড়ায় রাজ্যসভায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময়ের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব উথাপন করা হয়েছিল কিন্তু অন্যান্য সদস্যদের প্রচণ্ড আপত্তির চাপে সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে হয়। আজকের অবস্থাটা কিন্তু একেবারেই বিপরীত। ১৯৭০ সালে ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ কোটি টাকা। ১৯৮০ সালে সেটা নাকি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এই সব কাহিনী দুই দেশের মঙ্গলকামীদের হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার এনে দেয়।

* * *

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি যখন প্রায় অনিবার্যভাবে নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে তখন বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক এ-ভি বালিগার মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দেশপ্রেমিকরা ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি (ISCUS) গঠন করেন। ইতিমধ্যে দুই দেশের

সম্পর্ক পুনরায় সদ্ভাবের দিকে অগ্রসর হতে সুরু করেছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে সরকারী পর্যায়ে যে ভারত-সোভিয়েত যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তা রাষ্ট্রসংঘে অব্যাহত থাকে। সেখানে দুই দেশই বর্ণবৈষম্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে এবং বারংবার এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে কাশ্মীর ও গোয়ায় যখনই ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর আক্রমণ এসেছে, তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চীনা গণ-প্রজা-তন্ত্রকে রাষ্ট্রসংঘে স্বীকৃতি দেবার জন্য ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫০ সাল থেকে একযোগে চেষ্টা করে এসেছে। কোরীয় যুদ্ধ শুরু হবার অল্পকাল বাদেই (যেটা নিয়ে ভারত একটা আনাড়ির মতো কাজ করে ফেলেছিল) ১৯৪০ সালের ১৩ জুলাই তারিখে প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু স্তালিনের কাছে একটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়ে শান্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সেটা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ যখন মস্কোয় ভারতীয় রষ্ট্রদূত ছিলেন তখন স্তালিনের সঙ্গে তাঁর দু'বার হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক হয়। সে এক অস্বাভাবিক সম্মান। দ্বিতীয় বৈঠকে স্তালিন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণকে প্রতিশ্রুতি দেন যে পুর্ব-পশ্চিমের সকল বড় বড় সমস্যাই শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা হবে। ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত কে-পি-এস মেননও স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান এবং সেটাই বিদেশীর সঙ্গে স্তালিনের শেষ সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকারে স্তালিন মেননকে বলেন যে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা অত্যন্ত "সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত নীতি।" স্তালিনের মৃত্যুর (১৯৫৩ সালের মার্চ মাস) পর জওয়াহরলাল নেহরু ভারতীয় পার্লামেণ্টে সেই ঘটনার উল্লেখ করে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন যে স্তালিন ছিলেন "এ যুগের একজন স্রষ্টা।" মেননের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি (স্তালিন) ভারতের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। জেনেভা সম্মেলনে (১৯৫৪) সোভিয়েত রাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ বলেন যে "ভারত ইতিহাসের এক নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে...এবং

যে সব দেশ তাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংহতি সাধন করে বিশ্ব-সভায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণের প্রয়াস পাচ্ছে, ভারতের নাম তাদের পুরোভাগে।" ১৯৫৪-৫৫ ভিলাইতে সোভিয়েত সহায়তায় একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের আলোচনা সম্পন্ন হয়। সেই ভিলাইয়ের নাম আজ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের সঙ্গে একযোগে ভারত যে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা করে ১৯৫৪ সালে "প্রাভদা" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পুনরায় তার প্রশংসা করে। যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান হচ্ছে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা, পঞ্চশীল তারই প্রতিশব্দ।

১৯৫৫ সালটা ছিল রক্তাক্ষরে লেখা। সেটা হল বান্দুং বছর। সেখানে এশিয়ার আত্মসম্মানবোধ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের অধীনে সমভাবে নিপীড়িত যেসব জাতি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার লড়াই করেছিল, তারা সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার সংহতি সাধনের সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। তারা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে নিজেদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবার জন্য একযোগে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫৪ সালে স্বাক্ষরিত পাক্-মার্কিন চুক্তির ঘোষিত নীতি ছিল এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে লড়িয়ে দেওয়া। ভারত তার কুফলের অভিজ্ঞতা থেকে সজাগ হয়ে গিয়েছিল। তাই খুব ন্যায়সঙ্গতভাবেই সে ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলনে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে স্বাগত জানায়।

১৯৫২-৫৩ সালে ১৮ মাসের মধ্যে মোট ১৪টি ভারতীয় প্রতিনিধি দল সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর (১৯৫৩ সালের জুন) এবং ইন্দিরা গান্ধী (জুলাই-অগষ্ট ১৯৫৩), ছিলেন একদল ফুটবল খেলোয়াড়, চলচ্চিত্র শিল্পী এবং শিল্পপতিরা। ১৯৫৪ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের শহরে শহরে দারুণ সমাদর লাভ করে এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পী ও চলচ্চিত্র সঙ্গীত খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর-

নভেম্বর মাসে প্রথম ইসকাস (ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি) প্রতিনিধিদল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। সেই দলে বর্তমান লেখকও ছিলেন। ১৯৫৫ সালের মে মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টের এক বিরাট প্রতিনিধিদল সোভিয়েত ইউনিয়নে যান এবং প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরুর (কন্যা ইন্দিরা সহ) সোভিয়েত পরিদর্শনের (১৯৫৫ সালের মে মাসে) প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ করে আসেন। নেহরুকে সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন বিরাট সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়, আর কোন বিদেশী অমন সম্বর্ধনা সোভিয়েত ইউনিয়নে লাভ করেননি। মস্কোর ডায়নামো স্টেডিয়ামে বিরাট জনসভা (নেহরুর সম্বর্ধনা উপলক্ষে) ভারত-সেভিয়েত বন্ধুত্বের পরিধি সম্প্রসারণের নতুন সূচক হিসাবে আবির্ভূত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ রাষ্ট্রসংঘের ১০ম বার্ষিকী অধিবেশনেও ১৯৫৫ নেহরুর উচ্চ প্রশংসা করেন। "আমি আমার হৃদয়ের অনেকখানি রেখে গেলাম সোভিয়েত ইউনিয়নে," এই সুমধুর বাক্য দিয়ে নেহরু তাঁর বিদায় বাণী শেষ করেন। এই গভীর হৃদ্যতার ঠিক বিপরীত জিনিস লক্ষ করা যায় লণ্ডন টাইম্স্ এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (১৯৫৫ সালের ২৪ জুন)। তাতে লেখা হয়, "খুবই পরিতাপের কথা এই যে নেহরুর অবদান হচ্ছে (বিশ্ব শান্তিতে) সোভিয়েত নীতির সাধারণ অনুমোদন।" সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছিল ভারত-সোভিয়েত যৌথ বিবৃতির উপর।

এর পরই (১৯৫৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভ ভারত সফরে আসেন। এদেশে তাঁদের বিরাট ও স্বতঃস্ফূর্ত জনসংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কলকাতায় এতবড় জনসভা হয়েছিল যে তা বিশ্বের যে কোন জনসভার রেকর্ড ভঙ্গ করে। সোভিয়েতের প্রতি ভারতের সুগভীর সদিচ্ছাই তাঁতে প্রতিফলিত হয়। ইতিমধ্যে দুই দেশের নীতির মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার পরিবর্ধন।

তার পরের কাহিনী এত সুপরিচিত যে তা আর ব্যাখ্যা করে বোঝাবার অপেক্ষা রাখেনা। বিভিন্নক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার

তালিকা পেশ করে, তার গুণগত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে উদারভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য না পেলে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংহতি সাধন খুবই কষ্টকর হতো। "পশ্চিমীরা" ভারতের অনুরোধ উপেক্ষা করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিধাহীন চিত্তে অপর্যাপ্ত সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে। তারই ফলে ভারতে গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট আধুনিক ধাতু গলন শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, তৈল শিল্প, কয়লাখনি, বিদ্যুৎকেন্দ্র, ভেষজ-কারখানা ইত্যাদি। নয়া উপনিবেশবাদীরা বরাবরই চেয়েছে ভারত শ্লথ-গতি, পর-নির্ভরশীল হয়ে থাকুক; সোভিয়েত সহায়তায় আমরা বিরাট রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্ষেত্র গড়ে তুলে তাদের সেই কুমতলব ব্যর্থ করে দিতে পেরেছি। যখনই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতির উপর আঘাত হানতে চেয়েছে, তখনই তা প্রতিরোধ করবার জন্য সোভিয়েত বন্ধুত্ব চুড়ান্ত রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। কাশ্মীর, গোয়া, তাসখন্দ চুক্তি, পাকিস্তান ও চীনের মতো শত্রুভাবাপন্ন পড়শীর অবিরাম শত্রুতা, ভারত মহাসাগরে ঘাঁটি নির্মাণ ও অন্যান্য কৌশলে মার্কিনী ভীতি প্রদর্শন, বাঙলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান—সব বিপদেই সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি সবান্ধব।" সোভিয়েতের কাছ থেকে পুরো সাহায্য না পেলে ভারতের পক্ষে একটি প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলা খুবই কঠিন হতো। পরিষ্কার নীতির ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সাধনের প্রয়োজনে ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত (১৯৭১ সালের অগস্ট মাসে) না হলে বাঙলাদেশের অভ্যুত্থানে যে ভূমিকা ভারত গ্রহণ করেছিল, তা করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। এই দীপ্যমান দলিলটিই এই উপমহাদেশের জনগণের পক্ষে নতুন, বিশ্বব্যাপী, নয়া উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্র ও আঘাত প্রতিরোধের একমাত্র সম্মানজনক-পন্থার আলোকবর্তিকা।

লিওনিদ ব্রেজনেভের ঐতিহাসিক ভারত সফর (১৯৫৪ সালের নভেম্বরে) এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বীকৃত পারস্পরিক স্বার্থ-সাধক নীতিগুলোর রূপায়ণ এটাই প্রমাণ করেছে যে কোনো আকস্মিক সঙ্কট নিরসনের জন্য ভারত-সোভিয়েত চুক্তি (১৯৫৪) স্বাক্ষরিত হয়নি। এটা দুই দেশের ইতিহাস এবং চরিত্রের সঙ্গে সম্পুর্ণ সামঞ্জস্যপুর্ণ একটা নীতিসম্মত সিদ্ধান্ত। ব্রেজনেভের ভারত সফর এবং তারই পরিপূরক হিসাবে যা যা ঘটেছে তাতে এটাই সুচিত হয় যে বান্দুং চেতনা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে নিজের কাছে এবং ইতিহাসের কাছে ভারতের একটা দায়িত্ব হচ্ছে এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার ব্রত পালনের চেষ্টা করা। তাহলে সাম্রাজ্যবাদের লোভ ও ব্ল্যাক মেলের এই ঐতিহাসিক এলাকাটি সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। আর ভারত, মিশর, আফগানিস্থান এবং ইরাকের সঙ্গে সোভিয়েতের চুক্তির পর এশিয়ার ঘোলা জলে এখনও মৎস্যশিকারে ব্যস্ত নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় এশীয় চুক্তি সম্পাদিত হলে এতকাল সাম্রাজ্যবাদের পদানত এই প্রাচীন মহাদেশ ও তার প্রপীড়িত জনগণ শান্তি, আত্মসম্মান ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। পর্তুগাল, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের মতো এলাকায় স্বাধীনতার শক্তিগুলো এক নতুন গণ-স্বাধীনতার যুগের সূচনা করেছে। ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব এই নতুন যুগের উপাসক।

এই যুগপ্রবর্তনী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য দুই দেশের মৈত্রী আন্দোলন নিশ্চয়ই যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি তার বহুসংখ্যক ইউনিটের মাধ্যমে একটি জাতীয় আন্দোলনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এর প্রতি-সংগঠন এক বিরাট গণসংস্থা। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত উদ্দীপনা ও দক্ষতা সহকারে সেই সংগঠনটি পরিচালিত হয়। কিছুকাল আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব শুধু দুই দেশের গবর্নমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব নয়, এই বন্ধুত্ব দুই দেশের জনগণের

মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কথাটা খুবই খাঁটি। সেই কারণেই তিনি অক্টোবর বিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য ১৯৫৪ সালে রেডস্কোয়ারে গিয়েছিলেন। এই কারণেই কমিউনিস্ট না হয়েও ইসকাসের নয়াদিল্লির সভায় ব্রেজনেভকে "কমরেড" বলে ডেকেছিলেন। শব্দটির পারস্পরিক তাৎপর্য খুবই পরিষ্কার। জওয়াহরলাল নেহরুর ভাষায় বলা যায়, আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব হলো ভিলাইয়ের ইস্পাতের মতো—ভাঙবেও না, মচকাবেও না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আমাদের জনগণের অকপট বন্ধুত্বের স্বীকৃতি খুবই স্বাভাবিক। এতে কোনো অপবাদ এবং বিপদের কোনো আভাস নেই। যখন এই বন্ধুত্বের কথা বলা সহজ ছিল না, বরং বিপজ্জনকই ছিল, তখনকার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। পরাধীন ভারতের পুরোনো দিনগুলোয় কাউকে সোভিয়েত-বন্ধু বলার অর্থ ছিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করা। তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল, এমনকি জেলেও যেতে হতে পারত। কাজেই যারা "শক্তিধরের পক্ষে থেকে নিজেকে শক্তিশালী" বলে মনে করতেন, তাঁরা সেই ঝুঁকি নেননি। সোভিয়েত জনগণ কয়েক দশক্ ধরে যে ভয়ঙ্কর বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন; ১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসী আক্রমণের ফলে যে বিপদ অতি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে এবং সোভিয়েতের মানবদরদী জনগণ অতিমানবিক সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে অতি কঠোর লড়াই চালিয়ে যে বিপদ নিশ্চিহ্ন করেন, তার তুলনায় আমাদের ঝুঁকিটা অবশ্য নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। আমরা সেই সাহসের কিছু আভাষ পেয়েছিলাম এবং সমাজতন্ত্র সোভিয়েত জনগণকে অনন্য সাহস চারিত্রিক সম্পদ দিয়েছে, তা অনুধাবন করেছিলাম। সেই কারণেই সেই অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলোয় ভারত সোভিয়েতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

ফ্যাশিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সেই মহান দেশাত্ম-বোধক যুদ্ধের পর তিরিশ বছর অতীত হয়েছে। সারা দুনিয়ায় তার বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। ভারত আনন্দের সঙ্গে সেই উৎসবে

অংশগ্রহণ করেছে। এই বিজয়ের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধনজনের যে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করতে হয় ভারতবাসী তাও ভোলেনি। সোভিয়েতের সেই মহান লড়াইয়ের চেয়ে মানবিক কৃতিত্বের বৃহত্তর মহাকাব্য আর কিছু নেই। সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলার চেয়ে বড় কর্তব্যও মানবজাতির আর কিছু নেই। সারা তুনিয়ায় দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলছে সেই সংগ্রাম। ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় লড়াই চলছে আফ্রিকার পরাধীন অঞ্চলগুলোয়, নিপীড়িত চিলিতে এবং বিশ্বের নানা এলাকায়। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ১৯৪৫ সালের সোভিয়েত বিজয় থেকে এটা আমরা অনুধাবন করেছি যে কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রাক্-ইতিহাস শেষ হয়ে প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হবে এবং আগামীকালের অনিবার্য সূর্যোদয়ের মতো সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সম্পূর্ণ হবে।